বিজ্ঞানী চরিতকথা

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৯৬৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রক :
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা

ভূমিকা

"বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসু কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে রচিত হল "বিজ্ঞানী চরিতকথা'। এই বইটির জন্যও বাংলা এবং ইংরাজীতে লেখা বহু পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং কোষগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত গ্রন্থের মহান লেখকদের ঋণ আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি।

বর্তমান গ্রন্থটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পযন্ত আবির্ভূত পরিচিত কয়েকজন বিজ্ঞানীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। তবে অনিবার্য কারণবশতঃ গুটেনবার্গ প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর কথা "বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ" বইটিতে উল্লেখ না থাকায় তাঁদের কথাও আলোচনা করা গেল। যাঁদের কথা এবারেও প্রকাশ করা সম্ভব হলো না তাঁদের কথা পরবর্তী পুস্তকে প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

"বিজ্ঞানী প্রসঙ্গের" মত "বিজ্ঞানী চরিতকথা" গ্রন্থখানিও কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে কিছুটা সক্ষম হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বিনীত—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ক্রীশ্চিয়ান হাইগেন্স

[জন্ম—১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ।]

হাইগেন্সের আবির্ভাবকাল নিউটনের কিছু পরবর্তী। কিন্তু নিউটন প্রবর্তিত আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে যাঁরা কালজয়ী খ্যাতিলাভ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাইগেন্স অন্যতম। হাইগেন্সকে বলা হয় "আলোক তরঙ্গবাদের জনক"।

হাইগেন্সের জন্মস্থান হল্যাণ্ড। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকে তাঁর ছিল বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি অনুরাগ। পরিণত বয়সে তাই তিনি এই দুই বিষয়েই গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি নিউটন "আলোকতত্ত্ব" প্রকাশ করলে হাইগেন্স আলোক সম্বন্ধে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, নিউটনের কণিকাতত্ত্ব আলোকের কিছু কিছু ধর্মকে ব্যাখ্যা করলেও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তখনই হাইগেন্স আলোকের তরঙ্গতত্ত্বের কল্পনা করেন। তার কল্পনানুযায়ী কোন আলোকিত মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তরঙ্গ আমাদের চোখে আঘাত করলেই অনুভূতি জাগে।

আলোক তরঙ্গের বাহকরূপে হাইগেন্সই প্রথম ঈথারের কল্পনা

করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ধরণের অদৃশ্য ওজনহীন পদার্থে পরিপূর্ণ। হাইগেন্সের কল্পিত সেই ঈথার তরঙ্গের কথা দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন। শেষে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনই প্রমাণ করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈথার নামের কোন পদার্থ নেই। তবুও হাইগেন্স প্রবর্তিত তরঙ্গবাদ এখনও পরিত্যক্ত হয়নি। নিউটনের কণিকাবাদও যে পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন নয়। আধুনিক কালে আলোকের ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে গেলে কণিকাবাদ এবং তরঙ্গবাদ দুই মতবাদেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এইখানেই নিউটন এবং হাইগেন্সের বৈশিষ্ট্য।

যুগান্তর আনয়নকারী আলোকের তরঙ্গতত্ত্বের প্রবর্তকরূপে ওলন্দাজবিজ্ঞানী হাইগেন্সের নাম বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আরও একটি মহত্তর অবদান আছে। তিনিই প্রথম পেণ্ডুলামের সাহায্যে সময় মাপার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য ক্রোনোমিটার নামক একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে হাইগেন্স পরলোক গমন করেছেন।

গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট

[জন্ম—১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

"ফারেনহাইট" নামটি আমাদের বিশেষ পরিচিত। শিক্ষার্থী মাত্রেই জানে, আমাদের দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা যে থার্মোমিটার ব্যবহার করি, তাতে দাগকাটা থাকে বিজ্ঞানী ফারেনহাইটের উদ্ভাবিত স্কেল অনুসারে। হিমাঙ্ককে (যে

তাপমাত্রায় জল জমে বরফে পরিণত হয়) ৩২ ডিগ্রি এবং স্ফুটনাঙ্ককে (যে তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয়) ২১২ ডিগ্রি ধরে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মধ্যে দূরত্বকে মোট ১৮০ সমান ভাগে ভাগ করে একটি তাপমাত্রার স্কেল প্রবর্তন করেছিলেন ফারেনহাইট। উক্ত স্কেলটি আবিষ্কর্তার নামানুসারে ফারেনহাইট স্কেল নামে আজও প্রচলিত। বিশেষ করে ডাক্তারী থার্মোমিটারে ঐ স্কেল অনুসারেই দাগ কাটা হয়।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে জার্মানীতে ফারেনহাইটের জন্ম হয়। তাঁর পুরোনাম গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট। পিতা ছিলেন এক বড় ব্যবসায়ী। হয়ত পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁরই মত ফারেনহাইট বড় হয়ে ব্যবসায়ী হয়ে উঠবেন। কিন্তু বালকের ব্যবসার দিকে আগ্রহ আদৌ ছিল না। তিনি ভালবাসতেন লেখাপড়া করতে। তার উপর বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তার আন্তরিক টান। তাই পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করলেন না পিতা। বিজ্ঞান শিক্ষার সব রকমের ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করার পর ফারেনহাইট গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণার পর তিনি উন্নততর গবেষণার জন্য ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং বহু নামকরা বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য লাভ করেন। বিদেশ থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করার পর থার্মোমিটারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। সেই সময় পর্যন্ত থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়নি। তখন তরল হিসাবে থার্মোমিটারে অ্যালকোহলকেই ব্যবহার করা হতো। ফারেনহাইট বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্থির করেন, থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করলেই সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি পারদ থার্মোমিটার ব্যবহারের প্রথা ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন। যে স্কেলটির তিনি প্রবর্তন করেন সেই স্কেলটির নাম ফারেনহাইট স্কেল।

এই স্কেল প্রবর্তনের মূলে তাঁর একটি বদ্ধমূল ধারণা কাজ করেছিল। তিনি মনে করতেন, মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রি। এই হিসাবে তিনি নির্ণয় করেছিলেন বরফের গলনাঙ্ক ৩২ ডিগ্রি।

ফারেনহাইটের অন্যান্য আবিষ্কারও আছে। তাঁর আর একটি অবদান হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্রটির উন্নতিসাধন। ফারেনহাইট সারা জীবন গবেষণা করে গেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মান প্রদর্শন করেছিল। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি হল্যাণ্ডে দেহত্যাগ করেন।

অ্যাণ্ড্রুজ সেলসিয়াস

[জন্ম—১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর সুইডেনের এক অতি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাণ্ডজ সেলসিয়াস। সেলসিয়াসের পিতা ও পিতামহ উভয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতেন। বিশেষতঃ তাঁর পিতামহ এককালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। তাই অতি বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডল লাভ করেছিলেন সেলসিয়াস। বোধহয় পিতা ও পিতামহের অনুকরণে তিনিও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহ বোধ করেন এবং বি. এ. পাশ করার পর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কয়েক বছর পরে তাঁর কতকগুলি মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেলসিয়াসও খ্যাতি লাভ করেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে।

সেলসিয়াসের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য। সেলসিয়াস সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেননি। যোগদান করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে।

কিছুদিন অধ্যাপনার পর সেলসিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মানমন্দির স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারপর সচেষ্ট হন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি মানমন্দির স্থাপন করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছুকাল বিদেশের মানমন্দিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। অবশেষে সেলসিয়াস নিজ প্রচেষ্টায় সত্য সত্যই নির্মাণ করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক উন্নত মানমন্দির। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইউরোপে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সর্বাধুনিক মানমন্দির। আজও ঐ মানমন্দিরটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

সুদীর্ঘ দশ বছর কাল সেলসিয়াস নিজের তৈরি মানমন্দিরে গবেষণা করেছিলেন। এই সময় তাঁরই দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল মেরুজ্যোতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পূর্বে তিনি থার্মোমিটার সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করেন। এই পর্যায়ে তাঁর বড় অবদান "ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেল" নামে আর একটি তাপমাত্রার স্কেলের প্রবর্তন। সেলসিয়াস বরফের গলনাঙ্ককে শূন্য (০) ডিগ্রি এবং জলের স্ফুটনাঙ্ককে ১০০ ডিগ্রি ধরে এই স্কেলটি ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন। তাপমাত্রা নির্ণয়ের ব্যাপারে ঐ স্কেলটির বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। আবিষ্কর্তার নামানুসারে ঐ স্কেলের পাঠ "ডিগ্রি সেলসিয়াস"ও বলা হয়ে থাকে।

সেলসিয়াস দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করতে পারেন নি। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন। তিনি যদি পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণ করতেন তাহলে হয়ত বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও বহু মূল্যবান তথ্য জমা পড়তো। তবুও যা তিনি দিয়ে গেছেন তার পরিমাণও বড় কম নয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

[জন্ম—১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ ।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। তখন বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র ঘরে বসে অল্প-স্বল্প বিদ্যুৎ তৈরি করতে শিখেছেন। সে বিদ্যুৎ আবার ছিল কেবলমাত্র ঘর্ষণজাত। একখণ্ড রেশমের কাপড় নিয়ে কাচের দণ্ডকে ঘষলে অথবা ইবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে পাওয়া যেতো তড়িৎ। কিন্তু সে তড়িৎ মানুষের কোন কাজে আসতো না। কেবল বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে উৎপন্ন করতেন এবং নানাবিধ পরীক্ষা চালাতেন।

সেই সময় কয়েকজন বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ জাগে, তাঁদের তৈরি বিদ্যুতের সঙ্গে হয়ত মেঘগর্জনের সময় আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যে বিদ্যুৎ খেলে যায় তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কেমন করে পরীক্ষা করবেন?

এক ছিলেন প্রৌঢ় মার্কিন বিজ্ঞানী। ভাবলেন, মেঘগর্জনের সময় যদি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহলে তিনি ওকে নামিয়ে আনবেন মাটিতে।

বিজ্ঞানী এবার করলেন কি! রেশমের সুতো দিয়ে তৈরি করলেন সুন্দর একটি ঘুড়ি। কয়েকদিন ধরে খুব ভালভাবে রপ্ত করলেন ঘুড়ি ওড়ানটা। তারপর আকাশে মেঘ জমলেই ছুটে বেরিয়ে যেতেন ঘর ছেড়ে। সুতো ছেড়ে ছেড়ে অনেকদূরে তুলতেন ঘুড়িকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হতো না।

এদিকে বুড়োমানুষের কচি ছেলের মত শখ দেখে পাড়াপড়শীরা ভাবলেন, বুঝিবা লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন তো শেষপর্যন্ত থানায় পৌঁছে দিয়ে এল খবরটা। থানা থেকে পুলিশ

এল। সবিস্ময়ে দেখল তারা, ইনি আর কেউ নন—স্বয়ং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। যিনি ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মহান নেতা এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। থানায় লোকেরা বিজ্ঞানীর খেয়াল ভেবে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি ওড়ান কিন্তু ব্যর্থ হলো না। এক মেঘলাদিনে তিনি সত্য সত্যই আকাশের বিদ্যুৎকে নামিয়ে আনলেন মাটিতে। যদিও পরীক্ষাটি করতে গিয়ে অতি অল্পের জন্য তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছিলেন তবুও সেদিন প্রথম প্রমাণিত হলো, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে তাঁদের তৈরি বিদ্যুতের কোন প্রভেদ নেই। ওকে কাজে লাগাতে পারলে অসাধ্যকে সাধন করা যাবে—পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং আলো। তাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষাটির সত্যই কোন তুলনা হয়না। বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে এই পরীক্ষাটিও অন্যতম।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন গরিবের সন্তান। বাল্যে লেখাপড়ার সুযোগ লাভে হন বঞ্চিত। কিন্তু পড়ার দিকে আগ্রহ ছিল ভয়ানক। একটু বড় হতেই সে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। শেষে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন স্কুল ও কলেজের পরীক্ষাসমূহ।

হঠাৎ একদিন আমেরিকার আকাশে ঘনিয়ে এল বিপ্লবের কালো মেঘ। বৃটিশের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইলেন আমেরিকাবাসীরা। স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে জেগে উঠল নতুন উন্মাদনা। দেশকে তাঁরা স্বাধীন করবেনই।

সেই একই উন্মাদনায় মেতে উঠলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাঁর নিষ্ঠা ও সাহসিকতা মুগ্ধ করল দেশবাসীকে। অচিরে পরিচিত হলেন দেশনায়ক রূপে।

ঐ কারণে জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছেন রাজনীতি

করে। কিন্তু ভুলে যেতে পারেননি তাঁর প্রিয় বিষয় বিজ্ঞানকে। যে কোন প্রকারে সময় করে নিয়ে মেতে উঠতেন গবেষণায়। তাই বেশ কিছু জিনিস তিনি আবিষ্কার করে গেছেন। সেই আবিষ্কারগুলির মধ্যে এক জাতীয় চশমা, স্টোভ এবং আলোক দণ্ড প্রধান। তাছাড়া স্থির তড়িতের উপর তাঁর গবেষণা সর্বজন বন্দিত।

কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। সেই সব গ্রন্থের মধ্যে "পুওর রিচার্ডস্ অ্যালম্যানাক" নামক গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আমেরিকার স্বাধীন মৃত্তিকায় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বিজ্ঞানে কৃতি যাঁরা, তাঁরা লাভ করেন "ফ্রাঙ্কলিন পদক"।

ল্যাজারো স্প্যালানজেনি

[জন্ম—১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে জলে, মাটিতে, বাতাসে কত হরেক রকমের জীব বাস করে। তাদের খালিচোখে আমরা দেখতে পাইনা। অথচ সেই অদৃশ্য জীবাণুরা আমাদের কত যে ক্ষতিসাধন করে তার কোন সীমাপরিসীমা নেই। শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয় এমন যে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, তার শক্তির কাছে অমিত প্রতিভাধর মানুষকেও হার মানতে হয় বার বার।

অদৃশ্য জীবণু সম্বন্ধে গবেষণা করে বিজ্ঞানকে যাঁরা মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার পথকে উন্মুক্ত করে গেছেন তাঁদের মধ্যে ল্যাজারো

স্প্যালানজেনি নিঃসন্দেহে একজন। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইতালির একটি ছোট্ট শহরে তাঁর জন্ম হয়। স্প্যালানজেনির পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী। পুত্রও পিতার মত আইনজীবী হোক এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু বালক স্প্যালানজেনি ছিলেন অন্যরকম। বইয়ের পাতা অপেক্ষা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁকে অধিক আকর্ষণ করতো। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন, রাত্রির আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন, ছোট ছোট পোকামাকড় ধরে পালন করতেন,—এই ছিল তাঁর খেয়াল। কিন্তু যখনই পড়ার কথা উঠতো তখনই চোখ ফেটে জল আসতো।

দেখতে দেখতে দশ বার বছর বয়স হয়ে উঠল বালকের। তবুও পড়াশোনার নাম করেন না। ভয়ানক বিরক্ত হলেন পিতা। একদিন খুব তিরস্কার করলেন পুত্রকে। তারপর পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক রকম জোর করে পাঠিয়ে দিলেন পাড়ুয়া শহরে। উপায় না পেয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করতে হলো স্প্যালানজেনিকে। আইন-শাস্ত্রটাকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। দৈবক্রমে একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো বিজ্ঞানী "ভ্যালিসনিয়েরির" সঙ্গে। বালকের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন ভ্যালিসনিয়েরি। উৎসাহ দিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য। কিন্তু বালক অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন পিতার ইচ্ছা। তখন ভ্যালিসনিয়েরিই বালকের পিতাকে চিঠি লিখলেন স্প্যালেনজেনিকে বিজ্ঞান পড়ানর জন্য।

এবার সম্মত হলেন পিতা। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পুত্রকে ভর্তি করে দিলেন জেসুইট কলেজে। কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর স্প্যালানজেনি এবার ভর্তি হলেন বোলোগণা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইখানে অধ্যয়নের সময় তিনি আরম্ভ করেন গণিতের উপর গবেষণা। গণিতশাস্ত্রের উপর কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা

করেন এই সময় এবং সেই প্রবন্ধগুলি তাঁকে এনে দেয় বিজ্ঞানীর খ্যাতি।

পাশ করার পর স্প্যালানজেনি রেগিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-রূপে যোগদান করেন। সেই সময় "নীডহাম" নামে জনৈক ধর্মযাজক প্রচার করেন যে, জীবের মত জীবাণুদের পূর্বপুরুষ নেই। তারা স্বয়ংসৃষ্ট। নীডহাম একটি পরীক্ষা করেও সর্বসমক্ষে প্রচার করেন এই তথ্য। সবার ধারণা হলো, নীডহামের কথাটাই ঠিক। কিন্তু স্প্যালানজেনির আদৌ মনঃপূত হ'লো না কথাটা। বহু গবেষণার পর তিনি স্থির করলেন, নীডহামের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সেই সঙ্গে প্রমাণ করলেন, জীবাণুরা স্বয়ংসৃষ্ট নয়। তারাও বংশবিস্তার করে, তবে উচ্চশ্রেণীর জীবের মত ওরা দেহের অভ্যন্তরে সন্তান ধারণ করে না। জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি ঘটে বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা। অর্থাৎ এক একটি জীবাণুর দেহ একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ম দান করে

স্প্যালানজেনির উপরোক্ত আবিষ্কারটি প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। যদিও সে সময় তাঁর মতবাদের প্রতি বিশেষ কেউ গুরুত্ব আরোপ করেননি। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্প্যালানজেনিকে যথেষ্ট বাদানুবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণীবিজ্ঞানকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছিল তার মতবাদকে। একথা সত্য যে, পরবর্তীকালে যে সব জীবাণু-নাশক ঔষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মূলে আছে স্প্যালানজেনির এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি।

স্প্যালানজেনির গবেষণা কেবলমাত্র প্রাণীবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায়ও আছে তাঁর মহামূল্য অবদান। দীর্ঘকাল ধরে তিনি আগ্নেয় শিলাকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছিল পৃথিবীর বহু আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও

গবেষণাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন "ভলকানোলজি" বা আগ্নেয়গিরি-তত্ত্ব নামক একটি পুস্তকে। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। আগ্নেয়শিলা সম্বন্ধে এমন উন্নত গবেষণা পূর্বে আর হয়নি। বইখানির সমাদর আজও আছে।

প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্র সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন স্প্যালানজেনি। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, জীবদেহের পুষ্টির কাজ সম্পন্ন হয় যকৃতে উৎপন্ন গ্যাষ্ট্রিক রসের দ্বারা। শোনা যায়, বাদুড়ের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধেও স্প্যালানজেনি কিছুকাল গবেষণা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যও প্রদান করেছিলেন তিনি।

স্প্যালানজেনির প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনে ছিলেন পণ্ডিত। এই বিষয়গুলিতেও আছে তাঁর কিছু কিছু অবদান।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী। কৃতি অধ্যাপক হিসাবেও খ্যাতি ছিল সবত্র। কিন্তু তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন জীবাণুসংক্রান্ত গবেষণার জন্য। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর আবিষ্কারকেই ভিত্তি করে প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে একটি নবযুগের। তাই বিশ্বের সবকালের শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানী লোকান্তরিত হয়েছেন।

কাউণ্ট রামফোর্ড

[জন্ম—১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

তাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের চিরাচরিত ধারণাকে পরিবর্তিত করার জন্য কাউণ্ট রামফোর্ড বিজ্ঞানজগতে অমর হয়ে আছেন। আজকের বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করেন, কাউণ্ট রামফোর্ডই তাপগতিবিদ্যার আবিষ্কারক এবং তাঁরই আবিষ্কারের ফলে তাপবিজ্ঞান এত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রামফোর্ড। পড়াশোনা শেষে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। কথিত আছে, আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি গ্রেটব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধে যখন গ্রেটব্রিটেন পরাজয় স্বীকার করলো, তখন বাধ্য হয়েই দেশত্যাগ করে লণ্ডনে পলায়ন করতে হলো রামফোর্ডকে।

লণ্ডনে প্রথম ইঞ্জিনিয়াররূপেই কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। কিছুকাল প্রিন্স অফ্ ব্যাভেরিয়ার অধীনে চাকরি করার পর রামফোর্ড মিউনিখ শহরের অস্ত্রশালায় কামান তৈরির কাজে নিযুক্ত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অস্ত্রশালায় কাজ করার সময় একরকম আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন তাঁর প্রসিদ্ধ তাপগতিবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যটি।

রামফোর্ডের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, তাপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ কণা। সেই কণাগুলো এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হলেই তাপের উৎপত্তি হয়। রামফোর্ডও জানতেন সে কথা। একদিন কামান তৈরির জন্য একখানা ধাতবপাতকে ছিদ্র

করতে গিয়ে দেখলেন, পাতখানা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল। একটু বিস্মিত হলেন রামফোর্ড। তারপর কী ভেবে পাতখানা জলে নিমজ্জিত করে ছিদ্র করতে আরম্ভ করলেন। এবার আরও অবাক হলেন তিনি। দেখলেন, জল গরম হতে হতে একসময় ফুটতে আরম্ভ করলো। তখনই তাপসম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণার মূলে সন্দেহের উদ্রেক হল তাঁর। মনে মনে চিন্তা করলেন, তাপ যদি সূক্ষ্ম পদার্থ কণা হয় এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে যদি সঞ্চালিত হয় তাহলে ঠাণ্ডা ধাতব পাতের মধ্যে এত তাপ কোথায় ছিল—যা জলকে স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছাতে সাহায্য করলো ?

রামফোর্ড অনেক চিন্তা করে অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তাপ সঞ্চালন তাপ উৎপত্তির কারণ নয়। তাপের উৎপত্তি হয় ঘর্ষণের ফলেই। রামফোর্ড এবার তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করলেন লণ্ডনের নামকরা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়।

তখন চলছিল ইংলণ্ডের মহান বিজ্ঞানী ডেভির কাল। রামফোর্ডের প্রবন্ধ পাঠ করে তারও কেমন যেন সন্দেহের উদ্রেক হলো। রামফোর্ডের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য কতকগুলো বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করে দেখলেন। সেই পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটি ছিল বরফে বরফে ঘর্ষণ। ডেভি দেখলেন, ঘষণের ফলে বরফ গলে গিয়ে জলে পরিণত হলো। সবার ধারণা ছিল, বরফের মধ্যে তাপ সূক্ষ্ম কণিকার আকারে থাকেনা বলেই সেটি বরফ। ডেভি ভাবলেন, প্রাচীন ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে তাপহীন বস্তু থেকে কেমন করেই বা তাপ সঞ্চালিত হবে ?

ডেভির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। বলা বাহুল্য, তিনি রামফোর্ডের যুক্তিকেই সমর্থন করলেন। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা হলো একটি মহান সত্য। অতি তুচ্ছ একটি ঘটনা হলেও রামফোর্ড তাপবিজ্ঞানে আনলেন যুগান্তর।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামফোর্ড মিউনিখ শহরের অস্ত্রশালার চাকরি

পরিত্যাগ করে লণ্ডনে গমন করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রেও আছে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। রয়েল ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কাউন্ট রামফোর্ড অন্যতম হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডাঃ হানিমান

[জন্ম— ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু -১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।]

ডাঃ স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক হানিমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রবর্তক। তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র আজও সগৌরবে প্রচলিত। ডাঃ হানিমানের নাম জানেন না এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই আছেন।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল জার্মানির অন্তর্গত স্যাক্সনি প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ হানিমান। বাল্যকালে তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ হয়েছিল লিপ্‌জিগ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তিনি ভিয়েনা যাত্রা করেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত।

হানিমানের পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। তাই দূরদেশে অধ্যয়নকালে তাঁকে যথেষ্ট আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে পড়াশোনা বন্ধ রেখে চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হতে হয়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর একদিন দৈবক্রমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ট্রানসিলভেনিয়ার গভর্ণরের সঙ্গে। গভর্ণর সাহেব হানিমানের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এত খুশি হন যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়োগ করেন পরিবারের গৃহচিকিৎসক রূপে।

ট্রানসিলভেনিয়ার সেই গভর্ণর সাহেবটি ছিলেন অত্যন্ত

শিক্ষানুরাগী। দেশ বিদেশের বহু মূল্যবান পুস্তক তিনি সংগ্রহ করে স্থাপন করেছিলেন নিজস্ব একটি বিরাট গ্রন্থাগার। হানিমানের বাল্যকাল থেকে পুস্তকপাঠের নেশা ছিল প্রবল। হাতের কাছে এমন একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার পেয়ে লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। একদিন গভর্ণরকে জানালেন মনের ইচ্ছা। খুশিই হলেন গভর্ণর এবং যোগ্যপাত্র ভেবে গ্রন্থাগারের সমূহ দায়িত্ব অর্পণ করলেন হানিমানের হাতে।

হানিমান এবার ডুব দিলেন বই-এর মধ্যে। বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল লেখকদের লেখা পড়ে তাঁর জ্ঞানপিপাসা আরও বর্ধিত হলো। দেখতে দেখতে শিখে ফেললেন পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলি। যেখানে যত পেলেন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে লেখা পুস্তক, সবগুলি আরম্ভ করলেন বার বার পাঠ করতে। কিছুকাল পরে পুস্তকপাঠের নেশার সঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি নেশা। সেটি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা।

কেটে গেল বেশ কিছু দিন। হানিমান ভাবলেন, তিনি একটি নতুন ধরণের চিকিৎসাপদ্ধতির প্রবর্তন করবেন। মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন গভর্ণরের কাছে। তাঁকে উৎসাহিত করলেন গভর্ণরসাহেব এবং তাঁর প্রতিভা বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। হানিমানের নামও তখন ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে। তাঁর গবেষণাবলীকে স্বাগত জানাল চিকিৎসক সম্প্রদায় এবং শিক্ষায়তনগুলি। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "এরলানগেন" বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করলো এম. ডি. উপাধি দান করে।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হানিমান ট্রানসিলভেনিয়ায় অবস্থান করে গবেষণা করেছিলেন। ঐ বছর বিবাহ করার পর চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্নত গবেষণার জন্য যাত্রা করেন ড্রেসডেন শহরে। এ পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা এবং গবেষণা উভয়ই চলতো। ড্রেসডেনে আসার পর তিনি কেবল গবেষণা নিয়েই মত্ত হয়ে উঠলেন। দিনরাত কোন

সময়ই তাঁর গবেষণার বিরাম ছিল না। প্রথম দিকে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলি ভেষজ এবং আর্সেনিক বা সেঁকোবিষ। কিছুকাল পরে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ড্রেসডেন থেকে। পুস্তকখানির অভিনবত্ব মুগ্ধ করলো দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের। হানিমানের নাম আরও ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।

কেটে গেল আরও কয়েকটি বছর। গবেষণা গবেষণা করে যেন পাগল হয়ে উঠলেন হানিমান। আহার নিদ্রার ঠিক নেই। অর্থোপার্জনের ইচ্ছা,—তাও নেই। লেগে আছে সব সময় অভাব অনটন। তবুও উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ান বনে বাদাড়ে। সংগ্রহ করেন হরেকরকমের ভেষজ। আর সারারাত ধরে চলে কেবল পরীক্ষা আর পরীক্ষা।

সেই সময় আরও একটি অদ্ভুত খেয়াল পেয়ে বসেছিল তাঁকে। নতুন কোন ভেষজের কথা জানতে পারলেই ছুটতেন ভেষজটিকে সংগ্রহ করতে। এই উদ্দেশ্যে বহুবার তাঁকে ছুটতে হয়েছিল বিদেশ বিভূঁইতে। যেমন করেই হোক সংগ্রহ করতেন আর কখনও নিজে খেয়ে এবং অপরকে খাইয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করতেন। এইভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে বহুবার বিপদের সম্মুখীনও হয়েছিলেন।

সুদীর্ঘকাল ধরে হানিমান কাটিয়েছিলেন ভবঘুরের জীবন এবং বহু ভেষজকে উদরসাৎ করেছিলেন। একদিন তিনি খেলেন সিঙ্কোনা গাছের ছাল। তখন ম্যালেরিয়া রোগে চিকিৎসকরা প্রয়োগ করতেন ঐ সিঙ্কোনা গাছকে। হানিমান দেখলেন, সিঙ্কোনার ছাল খেতে তাঁর দেহে ঠিক ম্যালেরিয়ার মত কম্প দিয়ে জ্বর এল। বিস্মিত না হয়ে পারলেন না হানিমান। দু-চারজন সুস্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলে কয়ে খাওয়ালেন সিঙ্কোনার ছাল। আর আশ্চর্য! প্রত্যেকেরই এল কম্প দিয়ে জ্বর। হানিমান এতদিনে সিদ্ধান্তে এলেন, যে রোগের প্রতিষেধক সেই ভেষজকে সুস্থ দেহে প্রয়োগ করলে সেই

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। দীর্ঘ আট বছর গবেষণার পর হানিমান লাভ করলেন এই বিশেষ একটি সূত্র। এবার তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। গবেষণার ক্ষেত্র হলো প্রসারিত। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হলো পুনরায় নতুন গবেষণা।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বাইশ বছর কাল ধরে চলেছিল হানিমানের নতুন গবেষণা। কত শত শত সুস্থ শরীরে তিনি যে ভেষজ প্রয়োগ করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। হানিমানের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি প্রথমে নিজ দেহেই ভেষজ প্রয়োগ করতেন তারপর প্রয়োগ করতেন নিকট আত্মীয় এবং ছাত্রদের শরীরে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন ভেষজের প্রতিক্রিয়া।

বাইশ বছর গবেষণার পর হানিমান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এতদিনেই তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যে ওষুধের দ্বারা রোগ নিরাময় হবে সেই ওষুধকে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে সেই রোগ লক্ষণই প্রকাশ পাবে। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হানিমান প্রকাশ করেছিলেন "ল-অফ সিমিলারস" বা সদৃশ বিধান নামক একটি গ্রন্থের আকারে। এই পুস্তকের মূল বক্তব্য ছিল, যে কোন শক্তিশালী ওষুধ মানব শরীরে রোগের সৃষ্টি করে। ওষুধ যত শক্তিশালী হয় রোগ লক্ষণ সুস্থ শরীরে ততবেশি প্রকাশ পায়। এবং যে ওষুধ সুস্থদেহে যে রোগ উৎপন্ন করে, ঠিক সেই ওষুধটির দ্বারাই উক্ত রোগ নিরাময় হয়।

হানিমান পুস্তক রচনা করে চুপচাপ বসে রইলেন না। নিজের উদ্ভাবিত চিকিৎসাপদ্ধতিকে প্রচলন করতেও হলেন দৃঢ়সঙ্কল্প। এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রণয়ন করলেন ছোট ছোট পুস্তিকার এবং শিষ্যদেরও নিয়োগ করলেন প্রচারকার্যে। পদ্ধতিটির নাম দিলেন "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি"।

হানিমান তাঁর পুস্তকে চিকিৎসকদের কর্তব্য সম্বন্ধেও কতকগুলি নির্দেশ দান করেছিলেন। প্রথম নির্দেশ ছিল, চিকিৎসকগণ রোগের

পরিবর্তে রোগীর চিকিৎসা যেন উত্তমভাবে করেন। দ্বিতীয় নির্দেশানুযায়ী চিকিৎসকদের প্রয়োগ করতে হবে অতি সূক্ষ্মমাত্রার ভেষজ শক্তি। অপরাপর আরও কয়েকটি নির্দেশ ছিল এবং প্রত্যেকটি নির্দেশই ছিল চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের পক্ষে অতীব মূল্যবান।

হানিমানের আরও একটি মতবাদ আছে। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সাধারণ অবস্থার পরিবর্তনের নামই হলো অসুখ। অসুখের ফলে মানুষের জীবনীশক্তির সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে থাকে।

"ল অফ সিমিলারস" ছাড়াও হানিমান আরও কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসংক্রান্ত পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই পুস্তকগুলির মধ্যে অর্গানন এবং মেটেরিয়ামেডিকা প্রধান। প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে। মেটেরিয়ামেডিকা পুস্তকখানি প্রকৃতপক্ষে "ল অফ সিমিলারস" এবং আরও কয়েকখানি পুস্তকের একত্রে সমাবেশ।

হানিমান বিনা বাধায় তাঁর উদ্ভাবিত চিকিৎসাপদ্ধতিকে প্রচলিত করতে পারেননি। বহু চিকিৎসক সেদিন তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিলেন হানিমানকে। এখানে ওখানে গঠিত হয়েছিল বিরুদ্ধ জনমত। বিশেষতঃ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি হানিমানের পদ্ধতিকে। ফলে আরম্ভ হয় তর্কযুদ্ধ। কিন্তু হানিমান সহজে হার স্বীকার করলেন না। একাই রুখে দাঁড়ালেন সবার বিপক্ষে। দেশের এখানে ওখানে গমন করে চিকিৎসকদের বোঝাতে লাগলেন তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতিকে। সভাসমিতিতে জনগণকে উৎসাহিত করতে আরম্ভ করলেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং উপদেশ দান করে নানাস্থানে প্রেরণ করলেন উক্ত পদ্ধতিকে প্রচার করার জন্য। নিজেও আরম্ভ করলেন চিকিৎসা।

দেখতে দেখতে জনপ্রিয় হয়ে উঠল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসকও এগিয়ে এলেন এই পদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষা করতে। ভাল ফল লাভ করে তাঁরাও ধীরে ধীরে ভক্ত হয়ে উঠলেন।

কথিত আছে, হানিমান সুদীর্ঘ দশবছর কাল স্বীয় উদ্ভাবিত চিকিৎসা-প্রণালীকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং বহু জায়গায় তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বহুস্থানে তাঁকে ছোট ছোট চিকিৎসালয়ও স্থাপন করতে হয়েছিল এবং আগ্রহী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

হানিমান সুদীর্ঘকাল দুঃখ, দারিদ্র, কঠোর সাধনা এবং সমালোচনার মধ্যে কাটিয়েছিলেন সত্য কিন্তু শেষজীবন তাঁর অত্যন্ত গৌরবময়। তাঁর জীবদ্দশাতেই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ সাদরে গ্রহণ করেছিল তাঁরই প্রবর্তিত চিকিৎসাপদ্ধতিকে। বহু দেশ শ্রদ্ধাও জানিয়েছিল তাঁকে। বিদেশে যেসব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে প্রায়ই আসতো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। অনেকে আবার প্রার্থনা করতেন তাঁর উপদেশ। কোন কোন দেশ থেকে পরিদর্শনের জন্যও আসতো আমন্ত্রণ। হানিমান শতকর্মে ব্যস্ত থাকলেও প্রত্যাখ্যান করতেন না সে আমন্ত্রণকে। নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সেও চিকিৎসকদের সুপরামর্শদানের জন্য যাত্রা করতেন বিদেশে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হানিমান স্বদেশে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি।

জীবনের শেষভাগে তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। হানিমানের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন এক বিদুষী ফরাসী মহিলা। স্বামীর স্বপ্নকে যথার্থভাবে রূপ দিতে তিনিও কম পরিশ্রম করেননি।

হানিমানের মোট সন্তান সংখ্যা ছিল ন'জন। তাঁদের মধ্যে

মাত্র দুজন পুত্র এবং সাতজন কন্যা।

আজীবন কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই এই মহান কর্মবীরের জীবনাবসান হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হানিমান পত্নীসহ ফ্রান্সেই বসবাস করছিলেন। সেইখানে ৮৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

জোসেফ নিয়েপসে

[জন্ম—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।]

ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে গবেষণা করে যিনি বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে আছেন তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ নিয়েপসে। আধুনিক ফটোগ্রাফির এক রকম জন্ম হয়েছে নিয়েপসের হাতে। অবশ্য নিয়েপসের পরেও ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে উন্নততর গবেষণা হয়েছে এবং বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাপি চিত্রকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই। তাই ফটোগ্রাফি কোনদিন ভুলবেনা নিয়েপসেকে।

নিয়েপসের আবিষ্কারের কথা আলোচনা করতে হলে আগে ক্যামেরার কথা বলতে হয়। তখনকার দিনের ক্যামেরা আজকের মত ছিলনা। সে সময় ক্যামেরা ছিল কেবলমাত্র একটি কাঠের বাক্স এবং বাক্সের সম্মুখে থাকতো ছোট্ট একটি ছিদ্র। বাক্সের ভেতরের দেওয়ালে ছিদ্রের সোজাসুজি ঝুলিয়ে রাখা হতো একখানা ঘষা কাচের পর্দা। ছিদ্রপথে আলো পর্দার উপরে পড়লে দৃশ্যবস্তুর একটা উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হতো। শিল্পীরা ঐ প্রতিবিম্ব দেখে কাগজে ছবি আঁকতেন। এই পদ্ধতি যে কে কবে আবিষ্কার

করেছিলেন সে কথা আজ আর বলার কোন উপায় নেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে শিল্পীরা এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে আসছিলেন।

কিন্তু মানুষের চাহিদার শেষ নেই। যা পায়, তার চেয়ে আরও বেশি আশা করে। এই আশাই শিল্পীদের উন্নততর ক্যামেরার রূপ দিতে সচেষ্ট করলো। কত শিল্পী কতভাবে গবেষণা করলেন। শেষে বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বাক্সের ছিদ্রের গায়ে একখানা লেন্স এঁটে দিয়ে ছবিকে পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে তুললেন। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না শিল্পীরা। ছবি যদি আপনা হতে সৃষ্টি না হলো তাহলে যন্ত্র কেন? শিল্পীদের খেয়াল হলো, ক্যামেরার সাহায্যে যেমন করেই হোক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে স্থায়ী ভাবে বন্দী করবেন!

নিয়েপসেরও ছিল শিল্পী মন। ছবিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে তিনিই বোধহয় প্রথম হয়েছিলেন উৎসাহী। তাই তিনি খোঁজাখুঁজি করছিলেন এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের—যার দ্বারা কাজটা সহজতর হয়ে উঠবে। সেই সময় সিলভার ক্লোরাইড নামে একটি রূপার যৌগিক পদার্থের পরিচয় পাওয়া গেছিল। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছিলেন, সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে সূর্যালোকে ধরলে কালো হয়ে যায়। নিয়েপসে অনেক চিন্তা করে ঐ সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে নিয়েই আরম্ভ করলেন কাজ।

প্রথমে তিনি একখানা কাগজকে সিলভার ক্লোরাইডে সিক্ত করে ক্যামেরার ভেতরে ঘষাকাচের পর্দার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। ছিদ্রটিকেও ইচ্ছামত খোলা এবং বন্ধ করারও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ছিদ্রপথে দৃশ্যবস্তু থেকে আলো যখন কাগজের উপর পড়েছিল তখন গঠিত হয়েছিল একটি সুন্দর স্থায়ী ছবি। কিন্তু ছবিটি হয়েছিল উল্টো। উল্টো হওয়ার কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি নিয়েপসে এবং উল্টো ছবি থেকে প্রকৃত নিখুঁত ছবি পাওয়ার কোন চেষ্টাও করেননি। বোধ হয়, মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন

তিনি। তাই এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করেন আর একটি কৌশল। এবার সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণের পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলেন বিটুমেন মাখান একখানি তামার পাত। ক্যামেরার মধ্যে রেখে রোদে এক্সপোজার দিতে দেখা গেছিল, যেখানে রোদ পড়ে সেখানে বিটুমেন শক্ত হয়ে এঁটে যায় আর যেখানে রোদ পড়ে না সেখানে বিটুমেন পূর্ববৎ নরম থাকে। কয়েকঘণ্টা পরে ল্যাভেণ্ডার তেল দিয়ে তিনি তুলে ফেলেছিলেন বিটুমেনকে। দেখেছিলেন, বিটুমেন যেখানে শক্ত হয়ে গেছিল সেখানে তামার পাতের কোন ক্ষতি হয়নি কিন্তু যেখানে বিটুমেন নরম ছিল সেখানে তামার পাত ক্ষয় হয়ে গেছে। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর একটি ছবির ছাঁচ।

মনে মনে খুশিই হলেন নিয়েপসে। তামার পাতের কালি মাখিয়ে ছাপ দিতেই পাওয়া গেল দৃশ্যবস্তুর অবিকল প্রতিচ্ছবি।

নিয়েপসে এইখানে থেমে গেলেন না। ছবিকে আরও সুন্দর ভাবে বন্দী করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে তাঁর সঙ্গে এসে জুটলেন ড্যগোরে নামে আর একজন খেয়ালি শিল্পী। দুজনে আরম্ভ করলেন প্রাণপাত পরিশ্রম। কিন্তু কিছুদিন পরেই নিয়েপসে হলেন লোকান্তরিত। তখন ড্যগোরে একা চালালেন গবেষণা। শেষে নিয়েপসের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কৃতকার্য হলেন অনেকখানি। তবে প্রকৃত আধুনিক ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানী "আরগোর" হাতে—নিয়েপসের মৃত্যুর ছ'বছর পরে। যার মূলে নিয়েপসের দানই সর্বাধিক।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নিয়েপসে। তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত ধনবান। দেশ-বিদেশে সুনামও ছিল যথেষ্ট। তাই বালক নিয়েপসে

প্রাচুর্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিলাসব্যসনে থাকা সত্ত্বেও অপর দশটি ধনীর দুলালের মত ভোগবিলাসকে জীবনের সার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল। লেখাপড়ার প্রতিও ছিল ভয়ানক আগ্রহ। তাই অল্প বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময় নিয়েপসে মিলিটারিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর চোখ দুটি খারাপ হয়ে যায়। এবং স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ে। বাধ্য হয়ে চাকরি পরিত্যাগ করে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সুচিকিৎসার দ্বারা তিনি কিছুটা আরোগ্য লাভ করলেন সত্য তবে চাকরি করার ক্ষমতা রইলনা।

ফল একরকম ভালই হোল। নিয়েপসে মেতে উঠলেন গবেষণায়। তাঁর শিল্পীমন তৃপ্তিলাভ করল ক্যামেরাকে নিয়ে। একরকম বাকি জীবনটা তিনি অতিবাহিত করেছেন ক্যামেরার পেছনে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

জন ডালটন

[জন্ম—১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

পরমাণুবাদের প্রবর্তকরূপে জন ডালটনের নাম বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর প্রবর্তিত মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ধরা পড়েছে তবুও আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা প্রথম তিনিই করেছিলেন। সেই হিসাবে পরমাণুবিজ্ঞানের গুরু তিনি।

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক মহর্ষি কণাদ "কণাবাদ" তথা পরমাণুবাদ প্রথম প্রচার করেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, প্রত্যেকটি পদার্থ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। গ্রীক ডিমোক্রিটাসও ঐ একই মত পোষণ করেছিলেন। তবুও তাঁদের মতকে ঠিক ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। কারণ এঁরা মূলতঃ ছিলেন দার্শনিক। যদিচ দর্শন থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি তথাপি কণাদ এবং ডিমোক্রিটাস উভয়েই জড় বস্তুর উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেননি। বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল একেবারে গৌণ। তাঁদের প্রত্যেকের লেখা পুস্তকে যুক্তি অপেক্ষা কল্পনাই লাভ করেছিল প্রাধান্য। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে জন ডালটনকেই প্রকৃত পরমাণুবাদের প্রবর্তকরূপে আখ্যা দেওয়া যায়।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইগলস্‌ফিল্ড নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডালটন। গ্রাম্য বিদ্যালয়েই তাঁর প্রথম পড়াশোনা শুরু হয়। অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল: কথিত আছে, বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তিনি গ্রীক ও ল্যাতিন নামক দুটি দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান এবং অঙ্কের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করতেন ভয়ানকভাবে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করার পর ডালটন বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হন কলেজে। সেখানেও রেখেছিলেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অবশেষে বিজ্ঞানে এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভের পর ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে। সেই থেকেই তাঁর আরম্ভ হয় গবেষণা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।

জন ডালটনের মৌলিক গবেষণাগুলি প্রথম ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছিলেন গ্যাস প্রসারণ সূত্র এবং গ্যাসের অংশচাপ সূত্র। এই

সূত্র দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছিল। বহু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ডালটনের সূত্রগুলি যাচাই করতে। শেষে তাঁরা সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন সূত্রগুলিকে এবং ডালটনও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে। এই ঘটনা থেকে রসায়ন বিজ্ঞান ডালটন ব্যতীত আরও বহু বিজ্ঞানীর মতবাদ লাভ করে নিজ ভাণ্ডার পুষ্ট করেছিল।

গ্যাস আয়তনের সূত্র আবিষ্কারের পর ডালটনের মনে পদার্থের গঠন সম্পর্কে চিন্তা স্থান লাভ করেছিল। সেই চিন্তা থেকেই অচিরে জন্মলাভ করেছিল "পরমাণুবাদ" নামক ডালটনের বিখ্যাত মতবাদটি। তাঁর এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য কণা নিয়ে গঠিত। সেই অন্তিম কণাগুলির নাম পরমাণু বা এ্যাটম। এই কণাকে ভাঙ্গাও যায় না কিংবা গড়াও যায় না। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা ওজনে ও ধর্মে এক কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের ওজনে এবং ধর্মে আছে স্বাতন্ত্র্য। মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা আবার সরল ও সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হতে পারে।

ডালটন অবশ্য মৌলিক বা যৌগিক যে কোন পদার্থের সূক্ষ্মতম অন্তিম কণাকে পরমাণু নামে অভিহিত করেছিলেন। এইখানে ছিল তাঁর কল্পনার বড় রকমের ত্রুটি। সেই ত্রুটি সংশোধিত হয়েছিল অনেক পরে। তাছাড়া পূর্ববর্তী কল্পনাগুলিও আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞান স্বীকার করছে না।

ডালটনের উপরোক্ত সূত্র ও মতবাদগুলি ছাড়া আরও অনেক আবিষ্কার আছে। তিনি পরমাণুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং পরমাণুর ওজন সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গ্যাসের তরলীকরণের উপায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন,

উচ্চচাপে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় সমস্ত গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ডালটন জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন, তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম হিসাবে। জীবনে বহু সম্মান এবং পুরস্কারও লাভ করেছিলেন তিনি। লণ্ডনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ দান করেছিল সুবর্ণপদক।

আজীবন অধ্যাপনা এবং গবেষণার পর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

চার্লস হোপ

[জন্ম—১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা জানে, ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক। এই সত্যটি পরীক্ষার দ্বারা প্রথম যিনি প্রমাণ করে গেছেন তিনিই প্রসিদ্ধ ইংরাজ পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানী "হোপ"। হোপের উপরোক্ত আবিষ্কারের পরেই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা গেছিল, শীতকালে শীতপ্রধান দেশসমূহের পুকুর, হ্রদ কিংবা সাগরের জল বরফে রূপান্তরিত হয়ে গেলেও তলায় থাকে ৪° সেন্টিগ্রেডের জল। সেই কারণে জলচর প্রাণীরা সহজে চলাফেরা এবং জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

হোপের পরীক্ষাটিকে একটু ব্যাখ্যা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তাঁর পরীক্ষানুযায়ী শীতপ্রধান দেশে যখন খুব ঠাণ্ডা পড়ে তখন নদী কিংবা সাগরের উপরিভাগের জলও ঠাণ্ডা বাতাসের

সংস্পর্শে আসার জন্য শীতল হয়। শীতল জল অপেক্ষাকৃত ভারী বলে ঐ জল তলায চলে যায় এবং নিচের জল উপরে উঠে আসে। তারপর সে জলও তাপ হারিয়ে এক সময় নিম্নদেশে চলে যায় এবং তলার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল উপরে আসে। এইভাবে একটা পরিচলন স্রোত চলতে থাকে যতক্ষণ না তলার জল ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় না আসে। ৪° সেন্টিগ্রেডের জল অন্যান্য তাপমাত্রার জল অপেক্ষা ভারী বলে আর উপরে উঠতে পারেনা এবং তাপও হারাতে পারেনা। কিন্তু উপরের জলটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে ০° সেন্টিগ্রেডে এসে পড়লে বরফ হয়ে যায়। তলার জলটা কিছুতেই ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নেমে আসতে পারে না। ফলে বরফে রূপান্তরিত না হয়ে জলই থেকে যায়। একটি অতি সহজ পরীক্ষার দ্বারা হোপ এই সত্যটি প্রমাণ করেছিলেন। এবং এই সত্যটি প্রমাণ করার জন্য তিনি বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার্লস হোপ। তাঁর শিক্ষালাভও সম্পূর্ণ হয়েছিল ঐ এডিনবরাতেই। উজ্জ্বল ছাত্রজীবন এবং পঠদ্দশায় কয়েকটি বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রসায়নের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বাইশ বছর। এই বয়সেই তিনি একজন কৃতি অধ্যাপকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে হোপ রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান স্টনসিয়াম নামক ধাতুটি। হোপের পূর্বে এই ধাতুটির পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। দীর্ঘকাল গবেষণার পর হোপ স্টনসিয়াম ধাতুটির খুঁটিনাটি বিবরণ প্রদান করতে সক্ষম হন এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল আমন্ত্রণ।

গ্লাসগো অপেক্ষা এডিনবরায় গবেষণার সুবিধা হবে মনে করে হোপ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না। যোগদান করলেন রসায়নের সহকারী অধ্যাপক রূপে। পরে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেন এখানকার রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ। এই সময়ই তিনি আবিষ্কার করেন জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের তত্ত্বটি। অর্থাৎ প্রমাণ করেন, ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্ধক্য হেতু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। তথাপি শেষ বয়সেও গবেষণাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর বেশিদিন তিনি ধরাধামে ছিলেন না। মাত্র একবছর পরে অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। সেই বছর ইংলণ্ড আরও একজন বড় রসায়ন বিজ্ঞানীকে হারিয়েছিল। তিনি জন ডালটন। আরও আশ্চর্যের কথা, একই বছর এই দুই বিজ্ঞানীর আবির্ভাবও হয়েছিল।

জঁ্যা ব্যাপটিস্ট বায়ট

[জন্ম—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ।]

স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বায়ট স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একটি বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, যখন কোন পরিবাহীকে তড়িতাহিত করা হয় তখন আধান সর্বদা পরিবাহীর উপর পৃষ্ঠে অবস্থান করে কিন্তু ভিতরের পৃষ্ঠে যায় না। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ক্যারাডেও একটি পরীক্ষা করেছিলেন। সে পরীক্ষাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে

বায়টের পরীক্ষা ক্যারাডের পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, পরিবাহীর বাহিরের পৃষ্ঠে অবস্থান করাই তড়িতের ধর্ম।

বায়ট ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার জন্য তাঁর বাল্যশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। অল্প বয়সেই পড়াশোনা বন্ধ রেখে যোগ দিয়েছিলেন সৈন্য বিভাগে। শোনা যায়, চাকরি জীবনে বায়ট কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং সৈন্যবিভাগের চাকরি পরিত্যাগ করে অধিক বয়সে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য প্যারিসের একটি পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

অধ্যবসায় এবং অনুসন্ধিৎসা মানুষকে যে কত বড় করতে পারে তার প্রমাণ জ্যাঁ বায়ট। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি পলিটেকনিক বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি গ্রহণ করে বিশুদ্ধ গণিত ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় তিনি লাভ করেন পদার্থ বিদ্যায় এম.এস.সি. ডিগ্রি। সেই থেকে তাঁর জীবনের গতিমুখও পরিবর্তিত হয় এবং একটি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

বায়টের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় তিনি অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লা প্লাসের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লা প্লাসের গবেষণাবলীকে ভিত্তি করে কয়েকটি মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সেই থেকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞানী হিসাবে।

অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা সে সময় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সম্মান জানিয়েছিল বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থা। এমন কি সে দেশের সরকার তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ

করেছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল নরম্যাণ্ডির উপর অজস্র উল্কা বর্ষণ হলে তার কারণ নির্ণয়ের জন্য সরকার তাঁকেই নির্বাচিত করেছিলেন। বায়ট অতি অল্পদিনেই নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন উল্কাবর্ষণের প্রকৃত কারণ। সেই থেকে তিনি একজন অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বায়ট কিছুকাল গেলুসাকের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। শোনা যায়, গেলুসাকের প্রসিদ্ধ সূত্রটি আবিষ্কারের পশ্চাতেও আছে বায়টের অবদান। দীর্ঘকাল ধরে তিনি এককভাবে গ্যাসের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তারপরেই তড়িৎ-বিজ্ঞানের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন এবং এই পর্যায়ে তিনি আবিষ্কার করেন পূর্বোক্ত তথ্যটি।

আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বায়ট গবেষণা করেছিলেন। সেখানেও আছে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। বিশেষতঃ পোলারাইজেশন এবং প্রতিসরণ সম্বন্ধে বায়টের গবেষণা আলোকবিজ্ঞান কোনদিন ভুলতে পারবে না।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী এই মহান বিজ্ঞানী লোকান্তরিত হন। তাঁর মত বিচিত্র প্রতিভাধর বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

আঁদ্রে মারি আঁপেয়ার

[জন্ম—১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

"তড়িৎ চৌম্বক বিজ্ঞানের" প্রবর্তকরূপে বিজ্ঞান চিরকাল আঁদ্রে মারি আঁপেয়ারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর নামকে

চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তড়িৎবিজ্ঞানে একটি এককও প্রচলন করা হয়েছে। সংজ্ঞানুযায়ী যে তড়িৎপ্রবাহ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করালে প্রতি সেকেণ্ডে '০০১১১৮ গ্রাম রূপাকে বিন্যস্ত করতে পারে সেই পরিমাণ প্রবাহকে বলা হয় এক আঁপেয়ার।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই মহান বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। বাল্যশিক্ষা লাভের পর তিনি বিজ্ঞান পড়তে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। অতঃপর আঁপেয়ার গণিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে অধ্যাপক হিসাবে একটি কলেজে যোগদান করেন। তখন থেকেই তিনি আরম্ভ করেন গবেষণা।

আঁপেয়ার সারাজীবন ধরে কেবল তড়িৎ এবং চুম্বক সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রসিদ্ধ তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্বটি। এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করে তিনি তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার দিকনির্ণয় করতে সক্ষম হন।

আঁপেয়ারের গবেষণা ঐখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে তড়িৎ সংক্রান্ত বহু গবেষণা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি নিঃসন্দেহে উত্তরকালে তড়িৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার পথকে প্রশস্ত করেছে। জীবনে বহু সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেছিলেন আঁপেয়ার। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তিনি পরলোক গমন করেছেন।

জোসেফ লুইস গে-লুসাক

[জন্ম—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ।]

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী গে-লুসাক গ্যাস আয়তনিক সূত্রের প্রবর্তক। তাছাড়া অজৈব রসায়ন সম্বন্ধে তিনি প্রথম থেকে গবেষণা করে বহু মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাই রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর দান অপরিসীম।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের একটি শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গে-লুসাক। বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল অজৈব রসায়ন। কিন্তু বিজ্ঞানী জন ডালটন পরমাণুবাদ প্রকাশ করলে গে-লুসাক বিভিন্ন গ্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করতে প্রয়াসী হন। অবশ্য কেবলমাত্র গে-লুসাক নন, সে সময় বহু বিজ্ঞানীই গ্যাসগুলির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।

প্রায় পাঁচ বছর কাল গবেগণার পর গে-লুসাক প্রকাশ করেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্যাস আয়তনিক সূত্র। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন, একই উষ্ণতায় ও চাপে যদি দুটি গ্যাসীয় পদার্থ পরস্পর বিক্রিয়ার দ্বারা অন্য কোন গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন করে তাহলে তাদের আয়তনের একটা সরল অনুপাত থাকে। উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন ক্রিয়াশীল গ্যাসগুলির আয়তনের যোগফল নাও হতে পারে। তবে ক্রিয়াশীল গ্যাসগুলির আয়তনের সঙ্গে উৎপন্ন গ্যাসটিরও সরল অনুপাত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ক্রিয়ায় উৎপন্ন জলীয়বাষ্পের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন, দু আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক আয়তন

অক্সিজেনের ক্রিয়ায় গঠন করে দু আয়তন জলীয় বাষ্প। এখানে বিক্রিয়াকারী গ্যাসগুলির অনুপাত ২ : ১। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসটির অনুপাত গ্রহণ করলে সেই অনুপাত হয় ২ : ১ : ২। সূত্রটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

কেবল গ্যাস আয়তন সূত্র নয়, রসায়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে গে-লুসাকের মহত্তর অবদান। তিনি ক্লোরিন এবং আয়োডিন নামক দুটি মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। বিজ্ঞানী ডেভির সঙ্গে তিনিও জানিয়েছিলেন, আয়োডিন বস্তুটি একটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও জানিয়েছিলেন, সামুদ্রিক উদ্ভিদে আয়োডিন থাকে প্রচুর পরিমাণে এবং ক্লোরিনের ধর্মের সঙ্গে আয়োডিনের ধর্মের আছে যথেষ্ট মিল। সাইনোজেন এবং প্রুসিক অ্যাসিডের আবিষ্কর্তাও গে-লুসাক।

সারাজীবন গবেষণার পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে গে-লুসাক পরলোক গমন করেন।

এ্যামদিও অ্যাভোগেড্রো

[জন্ম—১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

বিজ্ঞানী জন ডালটনের জন্মের প্রায় দশ বছর পরে ইতালি দেশে আর একজন মহান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। অণুবাদের প্রবর্তক হিসাবে ডালটনের নামের সঙ্গে তাঁর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ডালটন প্রবর্তিত পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ধরা পড়লেও এই মহান বিজ্ঞানীর মতবাদ আজও ত্রুটিহীন বলে স্বীকৃত। নিরহঙ্কারী, অত্যন্ত সরল এবং নীরব এই

বিজ্ঞান সাধকের নাম এ্যামদিও অ্যাভোগেড্রো। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সুচিন্তিত মতবাদ গ্রহণ করেই সেদিনের বিজ্ঞানীরা নবাবিষ্কৃত বহু তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানে তাঁর মতবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে অ্যাভোগেড্রোর জন্ম হয়। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তিনি বিজ্ঞান পাঠ না করে আইনশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে কর্মজীবনেই তিনি শুরু করেন বিজ্ঞান চর্চা। তাই অ্যাভোগেড্রোর বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রি ছিল না।

আইন ব্যবসা শুরু করার পর অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে বিজ্ঞানকে একদিন বেছে নিয়েছিলেন অ্যাভোগোড্রো। কিন্তু তাঁর জীবনে এমন একদিন এল, যেদিন তিনি বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা করতে পারলেন না। পরিত্যাগ করলেন আইন ব্যবসাকে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন বিজ্ঞান সাধনায়।

অ্যাভোগেড্রোর গবেষণাগুলি ছিল রসায়ন বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। ডালটনের পরমাণুবাদ প্রকাশিত হলে অপরাপর বিজ্ঞানীদের মত অ্যাভোগেড্রোও এই নতুন মতবাদটির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে আত্মনিয়োগ করেন পদার্থের গঠন সম্পর্কে গবেষণায়। অ্যাভোগেড্রো লক্ষ্য করলেন, ডালটনের পরমাণুবাদকে প্রয়োগ করে কোথাও কোথাও সুফল লাভ করা গেলেও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পরমাণুবাদের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে চিন্তিত হলেন অ্যাভোগেড্রো। শেষে অনেক চিন্তা ভাবনার পর অবতারণা করলেন একটি প্রকল্পের। সেই প্রকল্পটি বিজ্ঞানে "অ্যাভোগেড্রো প্রকল্প" নামে খ্যাত।

অ্যাভোগোড্রো প্রকল্প অনুযায়ী কোন পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকলে এমন এক ক্ষুদ্রতম অবস্থায় আসবে যখন সেই কণিকাটির মধ্যে পদার্থের নিজস্ব গুণ বা ধর্ম বজায় থাকবে। কিন্তু আরও যদি ভাঙ্গা যায় তাহলে সেই চরম কণিকায় পদার্থের গুণ বজায় থাকবে

না। অ্যাভোগেড্রো পদার্থের পূর্ববর্তী অবস্থার নাম রাখলেন অণু এবং পরবর্তী অবস্থার নাম রাখলেন পরমাণু। তিনি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, একই উষ্ণতা এবং চাপে মৌলিক কিংবা যৌগিক সম আয়তন যে কোন গ্যাসের মধ্যে অণু থাকে সমান সংখ্যায়। যদিও তাঁর পূর্বে বার্জিলাস নামে একজন বিজ্ঞানী অনেকটা এই ধরণের একটি প্রকল্পের অবতারণা করেছিলেন। তবও তিনি অণুর কল্পনা না করে পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন বলে প্রকল্পটি ভুল প্রতিপন্ন হয়েছিল।

অ্যাভোগেড্রো প্রবর্তিত মতবাদটিকে সেদিন কিন্তু কেউ মেনে নিতে পারেননি। মেনে না নেওয়ার একমাত্র কারণ, বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পরমাণুকেন্দ্রিক। তাছাড়া ছিল ডালটন, বার্জিলাস প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। অর্থাৎ সবাই মনে করতেন ওদের মত প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মতবাদ ভুল হতে পারে না। সেই কারণে কোন বিজ্ঞানীই অ্যাভোগেড্রোর মতবাদকে যাচাই করতে অগ্রসর হলেন না। উপেক্ষিত হলো অ্যাভোগেড্রোর মতবাদটি।

শেষে কেটে গেল বেশ কিছুকাল। অ্যাভোগেড্রোর কথা এক রকম ভুলে গেলেন বিজ্ঞানীরা! তারপর এল অ্যাভোগেড্রোর ছাত্র স্ট্যানিসলাও ক্যানিজারোর কাল। তখনও বিজ্ঞানীরা ডালটনের পরমাণুবাদকে নিয়ে বৃথাই কষ্ট করছিলেন। ক্যানিজারো তখন উপস্থাপিত করলেন গুরুদেবের মতবাদটা। বিজ্ঞানীরা এমন হতাশ হয়ে উঠেছিলেন যে, কারুর মতবাদকে আর ফেলতে পারলেন না। দ্বিরুক্তি না করেই বসে গেলেন অ্যাভোগেড্রো প্রকল্পকে নিয়ে মাথা ঘামাতে।

এবার আর ব্যর্থ হলেন না বিজ্ঞানীরা। অ্যাভোগেড্রোর মতবাদকে কাজে লাগাতেই পরমাণু রাজ্যের বহু খবর দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অকূলপাথারে কূল পেলেন বিজ্ঞানীরা। উপেক্ষিত অ্যাভোগেড্রোর প্রতিভার প্রতি জানালেন

শ্রদ্ধা ও সম্মান। প্রকল্পটিকে প্রদান করলেন "যুগান্তকারী" আখ্যা। অবশ্য সেদিন অ্যাভোগেড্রো জীবিত ছিলেন না।

অ্যাভোগেড্রোর প্রকল্পকে প্রয়োগ করে সেদিন বিজ্ঞানীরা ডালটনের পরমাণুবাদকে সংশোধন করলেন, গে-লুসাকের সূত্রকে ব্যাখ্যা করলেন এবং প্রমাণ করলেন, যে কোন গ্যাসীয় অণু দুই পরমাণু বিশিষ্ট। পদার্থের আণবিক ওজনও নির্ণয় করা গেল। এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হলো যে, বিজ্ঞানীরা অ্যাভোগেড্রোর মতবাদকে 'সূত্র' রূপে আখ্যা প্রদান করে সম্মানিত করলেন। ক্যানিজারো অবশ্য গুরুদেবের সূত্রটিকে গবেষণার দ্বারা আরও মহান করে তুলেছিলেন।

জীবদ্দশায় অ্যাভোগেড্রো তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেও মৃত্যুর পরে লাভ করেছেন বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তাঁর দান রসায়নবিজ্ঞানে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাভোগেড্রো পরলোক গমন করেছেন।

॥ কার্ল ফ্রেডরিষ গাউস ॥

[জন্ম—১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।]

গণিতশাস্ত্রে "কার্ল ফ্রেডরিষ গাউস" একটি স্মরণীয় নাম। বিশুদ্ধ গণিত ও ফলিত গণিতে গাউসের অবদান বিচার করে অনেকে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন গণিতজ্ঞের সম্মানে ভূষিত করে থাকেন। বস্তুতঃ এই সম্মানের ন্যায্য অধিকারী তিনি। তাছাড়া কেবলমাত্র গণিতশাস্ত্র নয়, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও গাউস রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। তাই ফ্রেডরিষ গাউস সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল জার্মানীর ব্রাউন্‌সভাইগ নামক একটি শহরে এক দরিদ্র রাজমিস্ত্রীর ঘরে জন্ম হয় গাউসের। তাঁর পিতার নাম গেরহের্ড ডিড্রিক এবং মাতার নাম ডোরাথা বেনৎস। গাউসকে লেখাপড়া শেখাবার ক্ষমতা পিতার ছিল না। কিন্তু মাতা ডোরাথার ছিল শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ। পুত্রকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্রবলভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অর্থের সংস্থান করে বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরই এক সহোদর।

বালক গাউসও ছিলেন অত্যন্ত অধ্যবসায়ী। তাছাড়া তাঁর প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। অঙ্কে যেন সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কথিত আছে, মাত্র তিন বছর যখন তাঁর বয়স, মুখে আধো আধো বুলি, ঠিক সেই সময় একদিন পিতার হিসাবের ভুল ধরেছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালে মাত্র সাত বছর বয়সের সময় একটি সুবৃহৎ সমান্তর শ্রেণীর যোগফল মুখে মুখে নির্ণয় করে শিক্ষকদের বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। গণিতের শিক্ষক বালকের প্রতিভা দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজব্যয়ে কিনে দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক গণিতের পুস্তক। বালকও সম্মান রক্ষা করেছিলেন শিক্ষক মহাশয়ের। অতি অল্পদিনে কষে ফেলেছিলেন অঙ্কগুলি। আরও শোনা যায়, বিদ্যালয়ে পাঠকালে গাউস সংখ্যা-তত্ত্বের কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধান করে জার্মানীর সমস্ত বিজ্ঞানীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন। বার তের বছরের এক বালকের মধ্যে এমন প্রতিভা বিজ্ঞানীরা যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি সেদিন।

বিদ্যালয়ে পাঠকালেই গাউস গণিতকে নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জ্যামিতি। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে তিনি একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন

এবং বহু জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গাউস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এইখানে অধ্যয়নকালে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন সপ্তদশ বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজের অঙ্কন পদ্ধতি। তখন গাউসের বয়স মাত্র আঠার বছর। পরের বছর তিনি এমন আরও কতকগুলি জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করেন—যা প্রায় দু হাজার বছর ধরে প্রখ্যাত গণিতবিদরা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

জ্যামিতিতে গাউসের মৌলিক আবিষ্কারগুলি বিশ্বের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অধ্যয়নকালেই তিনি লাভ করেন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের সম্মান। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে গাউস প্রকাশ করেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার "প্রিন্সিপল অফ লিষ্ট স্কোয়ার্স"। এই আবিষ্কারটিকেই ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে "গাউসিয়ান ল' অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন" বা গাউসীয় স্বাভাবিক বণ্টন সূত্র। সূত্রটি গণিত ও পরিসংখ্যানের একটি মৌলিক সূত্র হিসাবে পরিচিত।

গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর গাউস গণিতে উচ্চতর গবেষণার জন্য ভর্তি হন হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে দান করে ডক্টরেট ডিগ্রী। কিন্তু আর্থিক অনটন এই সময় প্রবল আকার ধারণ করায় গাউসকে গবেষণা বন্ধ রেখে চাকরির চেষ্টা করতে হয়। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর দৈবক্রমে তাঁর সঙ্গে একদিন পরিচয় হয় ব্রাউন্‌স ভাইগের ডিউক কার্ল ভিল্‌হেল্‌মের সঙ্গে। ডিউক গাউসের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর গবেষণার ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করেন। গাউস পুনরায় নিমজ্জিত করলেন নিজেকে গবেষণার মধ্যে। কিন্তু এবারও দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। হঠাৎ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নেমে এল চরম

বিপর্যয়। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিউকও হলেন যুদ্ধে হত। অল্পদিন পূর্বে জনক জননীর ইচ্ছায় গাউস বিবাহও করেছিলেন। এবার বৃদ্ধ পিতমাতা এবং পত্নী সবাইকে নিয়ে অকূল সমুদ্রে ভাসলেন। বাধ্য হতে হলো চাকরির অন্বেষণে।

গাউসের চাকরির ক্ষেত্রে অবশ্য কোন অসুবিধা ছিল না। বহু জায়গা থেকে অধ্যাপকরূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু গাউস চাকরি অপেক্ষা গবেষণাকেই বেশি পছন্দ করতেন। চাকরিও করা হবে এবং গবেষণার কোন অসুবিধা হবে না। এমন চাকরি হঠাৎ লাভ করতে পারলেন না। শেষে গোত্তিঙ্গেন মানমন্দির থেকে এল ডাক। খুশি হলেন গাউস। গ্রহণ করলেন মানন্দিরের অধিকর্তার পদ। কিন্তু এই পদের জন্য বেতন ছিল খুবই কম। গবেষণা চালাতে এবং সংসারের খরচ মেটাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হলো। তাতেও গাউস এতটুকু দমলেন না। যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করে পরমানন্দে গবেষণা করতে লাগলেন।

দুর্যোগের পর আবার এল দুর্যোগ। দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানীর হলো পরাজয়। নেপোলিয়ান তখন জার্মানির উপর ধার্য করলেন যুদ্ধোত্তর কর। যাঁরা ছিলেন জার্মানীর বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের উপরও কর নির্দিষ্ট হলো হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক গাউসও বাদ পড়লেন না। একটি পয়সা সম্বল নেই অথচ কর ধার্য হল দু হাজার ফ্রাঙ্ক। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন গাউস।

তখনকার ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী লা প্লাস জানতেন গাউসের আর্থিক অনটনের কথা। গাউস যাতে বিব্রত বোধ না করেন সেইজন্য তিনি গাউসের হয়েই টাকাটা ফ্রান্সের রাজকোষে জমা করে দিয়েছিলেন। গাউস জানতেন না সে কথা। পরে জানতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং ধীরে সুস্থে পরিশোধও করেছিলেন লা-প্লাসের ঋণ।

রাজনৈতিক দুর্যোগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর পুনরায় গাউস মেতে উঠেছিলেন গবেষণায়। এই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, তড়িৎচুম্বকতত্ত্ব, ভূচুম্বকতত্ত্ব এবং ফলিত গণিত। তিনি যে যে বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন সেই সেই বিষয়েই রাখতে পেরেছিলেন উল্লেখযোগ্য অবদান। সেই সময় সিসিলির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজী গ্রহাণুপুঞ্জের সিরিস নামক গ্রহাণুটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সিরিসের আকার এবং ভর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন গাউস।

গাউস ছিলেন নীরব বিজ্ঞান সাধক। আপন গবেষণার ফলাফলগুলি লিখে রাখতেন কিন্তু প্রকাশ করতেন না। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলির বেশিরভাগ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। এমনকি গাউসের মৃত্যুর প্রায় ৪৩ বছর পরেও প্রকাশিত হয়েছে তার কতকগুলি গবেষণার ফলাফল।

গাউস ছিলেন অত্যন্ত উদার। মনটিও ছিল শিশুর মত সরল। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর কোনদিন ছিল না। অর্থের প্রতিও তাঁর লালসা ছিল না বিন্দুমাত্র।

গুণীকে শ্রদ্ধা জানান ছিল গাউসের একটি বড় গুণ। এমন কি শত্রুর গুণের প্রসংশা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না। যে নেপোলিয়ানের জন্য তাঁকে চরম দুঃখ বরণ করতে হয়েছিল, সেই নেপোলিয়ানের যখন পতন হয় তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখই প্রকাশ করেছিলেন। ফলে বিরাগভাজন হয়েছিলেন সমস্ত দেশবাসীর। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য করান হয়েছিল নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখতে।

গাউসের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজেকে কেবলমাত্র জার্মানীর লোক বলে ভাবতেন না। তাঁর মতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তিনিও একজন। দেশের বিভাগ তিনি পছন্দ করতেন না। বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী গাউস এই সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি

প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

বড় মাতৃভক্ত ছিলেন গাউস। জননীর শেষ বয়সে তিনি একেবারে কাছছাড়া হতে পারতেন না। সব সময় সেবা ও পরিচর্যা করতেন জননীর। কারও দ্বারা জননীর সেবা তাঁর মনঃপূত হত না।

শোক ও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। বিবাহের মাত্র চার বছর পরে তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে। দীর্ঘকাল পরে পুনর্বার যদিও তিনি বিবাহ করেছিলেন তবুও সুখ ছিল না তার কপালে। শেষ জীবনটা ছিল আরও দুর্বিষহ। তিনি বক্তৃতা দিতে ভালবাসতেন না, বিদেশে যাওয়াও পছন্দ করতেন না। এমনকি কথাও বড় একটা বলতেন না কারুর সঙ্গে। তাই অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুও। সেই কারণে মানুষের প্রতি যেন তাঁর ঘৃণা এসেছিল। শেষ বয়সে কিছুতেই বাহিরে বেরুতেন না। সব সময় পড়ে থাকতেন মানমন্দিরের মধ্যে। কথিত আছে, জীবনের শেষ ২৭ বছরের মধ্যে তিনি একটিবার মাত্র মানমন্দির ছেড়ে বাহিরে এসেছিলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৭৮ বছর বয়সে গাউস পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী হারিয়েছে প্রকৃত এক নীরব বিজ্ঞান সাধককে।

হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান উরস্টেড

[জন্ম—১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন উরস্টেড। তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী এবং দক্ষ

চিকিৎসক। পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প বয়সেই উরস্টেড আয়ত্ত করেছিলেন গ্রীক, ল্যাতিন, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান এই চারটি ভাষা।

উরস্টেড মাত্র বার বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করেন। তারপর তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়নের নিমিত্ত। কয়েক বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি লাভ করেন রসায়ান বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি। অতঃপর পিতার ইচ্ছায় তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত পুনরায় ভর্তি হন কোপেন-হেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী বিভাগে। কিন্তু এই সময় তিনি দর্শনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করায় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন স্থগিত রেখে দর্শন শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর উরস্টেড দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে পুনরায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানেও তিনি রেখেছিলেন যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর। শেষ পরীক্ষায় লাভ করেছিলেন একাধিক পুরস্কার।

কর্মজীবনে উরস্টেড চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ না করে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেইখানে তার সূত্রপাত হয় গবেষণার। সে সময় অনেক বিজ্ঞানীর মত তিনিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তড়িৎ-বিজ্ঞানের দিকে। একদিন ছাত্রদের সম্মুখে বিদ্যুতের ধর্ম আলোচনা করার সময় হাতেনাতে পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে এক রকম আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্বটি।

সেটি ছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। সর্বপ্রথম উরস্টেড প্রমাণ করলেন, তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে এবং ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই তত্ত্বটি আবিষ্কারের ফলেই তড়িৎ বিজ্ঞানে এসেছে যুগান্তর।

তাই তড়িৎ-বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন তিনি। অাঁপেয়ার, ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা উরস্টেডের পরীক্ষাকে ভিত্তি করেই স্থাপন করে গেছেন তাঁদের অক্ষয় কীর্তি স্তম্ভ। সেই কারণে উরস্টেডের পরীক্ষাটিকে কালজয়ী আখ্যা দেওয়া হয়।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ কোপেনহেগেনেই পরলোক গমন করেন উরস্টেড।

স্যার হামফ্রে ডেভি

(জন্ম—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ।)

স্যার হামফ্রে ডেভি বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিশেষত রসায়ন বিজ্ঞান ডেভির প্রতিভাকে যদি লাভ করতে না পারতো তাহলে হয়ত তাকে শত বছর পেছনে পড়ে থাকতে হতো। একমাত্র টমাস আলভা এডিসন ব্যতীত অপর কোন বিজ্ঞানী ডেভির মত এত বেশি আবিষ্কার করেননি।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর স্যার হামফ্রে ডেভি ইংলণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করে চিকিৎসকের বৃত্তিই গ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকে গবেষণা করা ছিল তাঁর একটা নেশা। আমাদের চারপাশের বস্তুরাশির উপরও ছিল তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টি। তাই চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ডেভি তাঁর পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করেননি। একটি ছোট গবেষণাগার স্থাপন করে অবসর সময়ে গবেষণায় মেতে থাকতেন। প্রথমদিকে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ।

উদ্দেশ্য ছিল, ওষুধ হিসাবে ওদের গুণাগুণ পরীক্ষা করা। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একরকম আকস্মিকভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন নাইট্রাস অক্সাইডের চেতনানাশক গুণ। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠার বছর এবং এই বয়সেই তিনি পরিচিত হন বিজ্ঞানীরূপে।

নাইট্রাস অক্সাইডের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কারের পর গবেষণা করার নেশা তাঁকে একরকম পেয়ে বসে। চিকিৎসা ব্যবসা এবার মাথায় উঠল। রাতদিন পড়ে রইলেন গবেষণাগারে। সেই সঙ্গে রাসায়ন বিজ্ঞান লাভ করতে লাগল একে একে মূল্যবান সম্পদ।

ডেভির উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় রাসায়নিক পদার্থকে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানকে তিনি উপহার দিয়েছেন সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নামক দুটি ক্ষার ধাতুকে। ঐ সময় ডেভি তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলি প্রায় একশ' বছর ধরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ডেভি হ্যালোজেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে হ্যালোজেন পরিবারের সদস্য ধরা হয়। ডেভি ঐ পরিবারের বিখ্যাত মৌলিক পদার্থ ক্লোরিনকে নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন বহু মূল্যবান তথ্য। বিজ্ঞানীদের একটি বড় ভুলকেও সংশোধন করেছিলেন তিনি। আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, অ্যাসিড মাত্রই অক্সিজেনের এক একটি যৌগিক। অর্থাৎ যে কোন অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করলে অক্সিজেন পাওয়া যাবে। ডেভিই প্রথম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, সব অ্যাসিডে অক্সিজেন নেই কিন্তু হাইড্রোজেনকে থাকতেই হবে। তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো, বিজ্ঞানীরা "অক্সিজেন" (অম্লজান) এই

নামকরণের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। কারণ অক্সিজেনের অর্থ হচ্ছে "অম্ল উৎপাদক।"

ক্লোরিন সম্বন্ধে ডেভির গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। "ক্লোরিন" এই নামটিও তিনি রেখেছিলেন। হ্যালোজেন পরিবারের অপর দুটি সভ্য ফ্লোরিন ও আয়োডিন সম্বন্ধেও ডেভি দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কারও করেছিলেন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

কতকগুলি ধাতু আবিষ্কার ডেভির জীবনের অক্ষয়কীর্তি। লিথিয়াম নামে একটি ক্ষার ধাতুর তিনিই আবিষ্কর্তা। তিনিই স্টনসিয়াম্ নামক মৃত্তিকা ধাতুটির সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত। তাছাড়া বেরিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম নামক ধাতু দুটিকে ডেভিই আবিষ্কার করেছেন।

ডেভির আর একটি মহান আবিষ্কার "নিরাপত্তা বাতি"। খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি এই বাতিটি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এখন বাতিটিকে বলা হয় "ডেভির নিরাপত্তা বাতি"। আজকাল খনিতে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা হলেও নিরাপত্তা বাতির যুগ শেষ হয়নি। হয়ত কোনদিনই শেষ হবে না। যুগ যুগ ধরে খনি শ্রমিকেরা বহন করে চলবে তাঁর নাম।

ডেভির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার মনে হয় "বিজ্ঞানী ফ্যারাডে"। এক অতি সাধারণ ও অশিক্ষিত দপ্তরীকে তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন। যার জন্য বিজ্ঞান লাভ করেছে আর এক অসামান্য প্রতিভাধরকে। ডেভির মানুষ চেনার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলেই হয়ত পৃথিবী লাভ করেছে ফ্যারাডেকে। যাঁর প্রতিভার স্পর্শে পৃথিবীতে নেমে এসেছে বিদ্যুতের যুগ। ডেভিই দিয়েছিলেন ফ্যারাডেকে বিজ্ঞান মন্ত্রে দীক্ষা।

মানুষ হিসাবে ডেভি ছিলেন অত্যন্ত উদার, সহজ, সরল ও

অনাড়ম্বর। তাঁর কাছে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, কোন ভেদাভেদ ছিল না। অর্থ, সম্মান, কোন কিছুই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাইতো দেশ বিদেশের বহু জায়গা থেকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য ডাক আসতো তাঁর। জীবনে কারও মনে তিনি ব্যথা দিতে পারতেন না। চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করে জনসেবাও করে গেছেন সারা জীবনকাল। তাইতো জীবদ্দশাতেই তিনি পূজিত হয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে। দেশ বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে লাভ করে ধন্য হয়েছিল। সম্মানও জানিয়েছিল পৃথিবীর শত শত প্রতিষ্ঠান।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে, এক রকম অকালেই ডেভি পরলোক গমন করেছেন। অনেকের বিশ্বাস, কিছুকাল ধরে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসকে নিয়ে তিনি পরীক্ষা করতেন বলে অকালে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়েছে। কথিত আছে, ক্লোরিন সম্বন্ধে গবেষণার সময় একদিন তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। সেই থেকে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বেড়ে যায়। তার মৃত্যুতে পৃথিবী তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে অকালে হারাবার দুর্ভাগ্য বরণ করেছে।

জর্জ সাইমন ওহম

[জন্ম—১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

জর্জ সাইমন ওহম ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। কিন্তু পড়াশোনায় ছিল অত্যন্ত আগ্রহ। তাই বাল্যকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। একটানা পড়াশোনা করার সৌভাগ্য তাঁর কোনদিনই

হয়নি। মাঝে মাঝে পড়া বন্ধ করতে হয়েছে। তারপর এখানে ওখানে কিছু কিছু রুজি রোজগার করে আবার পড়তে হয়েছে। অবশেষে বহুকষ্টে তিনি বি. এ. পাশ করে জেস্যুইট হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ওহম। তাছাড়া বিজ্ঞানে গবেষণা করার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। সেই কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালেও তিনি আরম্ভ করেন গবেষণা।

সেই সময়ে প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞানীই তড়িৎবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। সাইমন ওহমও তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। একদিন ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। আবিষ্কার করলেন একটি মহান সূত্র। সেই সূত্রটি তড়িৎবিজ্ঞানে "ওহমের সূত্র" নামে পরিচিত। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরীক্ষা থেকে বিশ্ববাসী জ্ঞাত হলো, তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদের সমানুপাতিক হয়।

ওহমের উপরোক্ত সূত্রটি প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক ও প্রায়োজনীয় সূত্র হিসাবে স্বীকার করে নিলেন বিজ্ঞানীরা। নুরেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কেবলমাত্র সম্মান প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হলেন না, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত করলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে। পরে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পূর্বতন পদ পরিত্যাগ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগদান করেন।

ওহমের মহান আবিষ্কারের জন্য বহু বিজ্ঞান সংস্থা তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল! ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত করেছিল স্বর্ণপদক প্রদান করে। তড়িৎবিজ্ঞানে একটি এককও প্রচলিত তাঁর নামে। ওহম চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর সূত্রটির জন্য। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

মাইকেল ফ্যারাডে

[জন্ম—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।]

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

লণ্ডনের এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে জনৈক প্রৌঢ় ইংরাজ বিজ্ঞানী ভারি সুন্দর একটি পরীক্ষা দেখাচ্ছিলেন, পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ—

বিজ্ঞানীর সম্মুখে একটি টেবিলে বসান ছিল কয়েক ইঞ্চি লম্বা এবং প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি সিলিণ্ডারের আকৃতিবিশিষ্ট কার্ডবোর্ড। কার্ডবোর্ডের চারপাশে বেশ কয়েক পাক তামার তার জড়ান। তারের দুইপ্রান্ত যুক্ত ছিল একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে। বিজ্ঞানী একটি চুম্বক শলাকাকে খুব তাড়াতাড়ি কার্ডবোর্ডের উপরে ধরতে গ্যালভানোমিটারের কাঁটাটির বিক্ষেপ ঘটল আর চুম্বককে সরিয়ে নেওয়ার সময় দেখা গেল বিপরীতমুখী বিক্ষেপ।

পরীক্ষাটি দেখে সেদিন অনেকে যেমন বিজ্ঞানীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল তেমনই নাসিকা কুঞ্চিতও করেছিলেন কেউ কেউ। ভাবটা যেন এই, এতবড় নামকরা যে বিজ্ঞানী—তার হাতে কিনা সাধারণ একটা খেলনা জাতীয় পরীক্ষা?

একজন মহিলা আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন: আপনার পরীক্ষাটি সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ কাজে লাগবে এটি মানুষের? গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী: জানিনা। তবে আপনাকেও আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই?

—কী প্রশ্ন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

—আপনারা ছোট শিশুকে লালনপালন করেন কেন?

ভদ্রমহিলা সেদিন বিজ্ঞানীকে কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা

নেই। তবে ঐ একই প্রশ্ন রেখেছিলেন তখনকার ইংলণ্ডের "চ্যান্সেলর অফ দি এক্সচেকার" মিঃ গ্লাডষ্টোন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন: দেখলাম তো বটে। কিন্তু কোন্ কাজে আসবে এই পরীক্ষা?

সাধারণ এক মহিলার প্রশ্নে ফ্যারাডে বিশেষ কিছু মনে করেননি। কিন্তু গ্লাডষ্টোনের কথায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারলেন না। তবুও নিজেকে যথাসম্ভব সংবরণ করে নিয়ে মুখে ঈষৎ হাসির আভা এনে বলেছিলেন: আপনি যদি আরও কিছুকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তাহলে দেখবেন, ঐ সাধারণ পরীক্ষাটিকে অবলম্বন করে ইংলণ্ডে আসছে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা।

বিজ্ঞানীর কথা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। তাঁর ঐ পরীক্ষাটিকে কেন্দ্র করে অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হয়েছিল ডায়নামো। ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের শিল্পক্ষেত্রে এসেছিল এক বড় রকমের বিপ্লব। কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল ইংলণ্ড এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছিল নতুন দিগন্ত।

সেদিনের সেই প্রৌঢ় ইংরাজ বিজ্ঞানীর নাম মাইকেল ফ্যারাডে—বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এমন কি পৃথিবীর সবকালের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম তিনি। এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিজ্ঞানী শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের নেউইংটনে একটি দরিদ্র কর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ফ্যারাডে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হন। মাত্র চৌদ্দ বছর যখন তাঁর বয়স সেই সময় তাঁকে অর্থোপার্জনের নিমিত্ত চাকরির অন্বেষণ করতে হয়। কথিত আছে, ঐ অল্প বয়সেই একটি বইয়ের দোকানে বই বাঁধাই এবং বই বিক্রয়ের কাজে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বই পড়ার দিকে ফ্যারাডের ছিল অত্যন্ত আগ্রহ। যখনই সময় পেতেন তখনই ডুবে যেতেন বইয়ের মধ্যে। কখনও কখনও সারারাত কেটে যেত বই পড়তে পড়তে। যেন বই পড়ার নেশায় মেতে উঠেছিলেন তিনি।

কিছুকাল পরে ফ্যারাডের বই পড়ার নেশা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল এবং বিজ্ঞান ও গণিতের বইর দিকে আকর্ষণ অনুভব করলেন সর্বাধিক। যেখানে যত বিজ্ঞানের বই পেতেন সবগুলিকে না পড়ে কিছুতেই স্বস্তি অনুভব করতে পারতেন না। কিন্তু ফ্যারাডের লেখাপড়া কম থাকার জন্য সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত না তার পক্ষে। অনেক সময় ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাতেও হতাশ হতেন না ফ্যারাডে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাতেন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

সে সময় ইংলণ্ডে চলছিল মহান বিজ্ঞানী ডেভির কাল। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে প্রায়ই যেতেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য। সে সুযোগ নষ্ট করলেন না ফ্যারাডে। ডেভি যেদিন রয়েল সোসাইটিতে আসতেন সেদিন যে কোন প্রকারে সুযোগ করে ছুটে যেতেন বক্তৃতা শুনতে।

ডেভির বক্তৃতার সমস্ত অংশ ফ্যারাডে বুঝতে পারতেন না। তাই অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। কখনও বক্তৃতাগুলি বসে বসে কাগজে "নোট" করতেন এবং ঘরে বসে সারারাত ধরে চিন্তা করতেন অথবা ছোট ছোট পরীক্ষা করে দেখতেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হতো না। তথাপি নিরুৎসাহ হতেন না ফ্যারাডে। দ্বিগুণ আগ্রহে চিন্তা করতে আরম্ভ করতেন ডেভির বক্তৃতামালা।

শেষে অজানাকে জানার কৌতূহল ফ্যারাডেকে দুঃসাহসী করে তুলল। একদিন ডেভিকে সরাসরি চিঠি লিখে বসলেন কতকগুলি

পরীক্ষার ফল তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। চিঠি পেয়ে অবাক হলেন ডেভি। সদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এক সাধারণ দপ্তরীর কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। হাতে যেন স্বর্গ পেলেন ফ্যারাডে। নির্দিষ্ট দিনে সকালে উঠে একরকম হাওয়ায় ভর করে ছুটে গেলেন ডেভির কাছে।

ডেভি এবং ফ্যারাডের সেদিনের সেই সাক্ষাৎকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বল্পশিক্ষিত সেই দপ্তরীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অবাক হলেন ডেভি। জ্ঞানের যেন এক মহাসমুদ্র দেখলেন তিনি। ফ্যারাডের কৌতূহল চরিতার্থ করতে গ্রহণ করলেন তাঁকে নিজের সহকারীরূপে। যেন মণিকাঞ্চন যুক্ত হলো একই সঙ্গে।

ডেভি ফ্যারাডের প্রতিভা বিকাশের সব রকমের ব্যবস্থা করলেন। অবসর সময়ে নিজে শিক্ষাদান করতেন, কোন কিছু গবেষণা করতে গেলে পাশে রাখতেন ফ্যারাডেকে। এমনকি বিদেশে বক্তৃতা প্রদানের জন্য গমন করলেও সঙ্গী করতেন ফ্যারাডেকে। গুরুদেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একদিন ফ্যারাডে প্রতিষ্ঠিত হলেন বিজ্ঞানীরূপে। যদিও সে সুযোগ আসতে অনেক দেরি হয়েছিল।

প্রথমদিকে ফ্যারাডে ডেভির সঙ্গেই রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডেভির উৎসাহে তিনি স্বাধীনভাবে গবেষণা শুরু করেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী উরস্টেড চুম্বকের উপর তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করায় ফ্যারাডে তড়িৎ চুম্বক সম্বন্ধে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি এ বিষয়ে আরম্ভ করেন গবেষণা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভির মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে তিনি আবিষ্কার করেন তড়িৎ চৌম্বক আবেশের নিয়মগুলি। তিনি প্রমাণ করেন, একটি চুম্বক বা তড়িদ্‌বাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য

একটি সংহত বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল সৃষ্টি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই আবিষ্কারই ফ্যারাডেকে দিয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান। তাঁর এই আবিষ্কার তড়িদ্‌বিজ্ঞানে এনেছে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন। সম্ভব হয়েছে জেনারেটার, ট্রান্‌সফরমার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তড়িৎ যন্ত্রের উদ্ভাবন।

ফ্যারাডের প্রতি প্রথম সম্মান প্রদর্শন করেছিল লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি। এই প্রথম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞান সংস্থার 'লেকচারার' হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বর্জিত এক ব্যক্তি। পৃথিবীতে এমন নজির খুব কমই আছে।

ফ্যারাডের আবিষ্কারের সংখ্যা প্রচুর। তার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারটি তরলের তড়িৎ বিশ্লেষণের নিয়মাবলী। "তড়িৎ চৌম্বক আবেশের নিয়মাবলীর' মত এই নিয়মগুলিও বিজ্ঞানে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের আবিষ্কারটি যেমন বিজ্ঞানের একটি নতুন দিকের আলোকপাত করেছিল তেমনই পরবর্তী আবিষ্কারটি থেকে সূত্রপাত হয়েছে তড়িৎ রসায়নবিদ্যা নামক রসায়নের আর একটি শাখার উপর গবেষণা।

ফ্যারাডের অন্যান্য আবিষ্কারগুলির মধ্যে আছে 'ফ্যারাডে এফেক্ট" নামে পরিচিত আলোকের পরিবর্তন, ক্লোরিন গ্যাসকে তরলে রূপান্তরকরণ এবং বেনজিন নামক কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক পদার্থ। উপরোক্ত তিনটি আবিষ্কারই উত্তরকালে বিজ্ঞানকে এনে দিয়েছে বহু নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি। বিশেষতঃ "চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোকের পরিবর্তন" এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফ্যারাডে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজ অধ্যবসায়ের বলে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, উদার, নিরহঙ্কারী, ধর্মভাবাপন্ন এক ঋষিপ্রতিম

ব্যক্তি। অনাড়ম্বর জীবনই তিনি ভালবাসতেন। অর্থ এবং সম্মানের প্রতি তাঁর লোভ কোনদিনই ছিল না। কথিত আছে, সরকার প্রদত্ত "নাইট' উপাধিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আত্মমর্যাদা বোধ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রখর। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভয়ানক আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু পেনসন গ্রহণ করতে আদৌ সম্মত হতে পারেননি। শেষে যখন খুবই অভাবের মধ্যে পড়েন তখন বন্ধুবান্ধবের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে এবং তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীলের আগ্রহাতিশয্যে অতি সামান্য অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তারই অবিষ্কারের ভিত্তিতে তখন ইংলণ্ড উপার্জন করছিল কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।

ফ্যারাডে সর্বযুগের এবং সর্বকালের বিজ্ঞানীদের আদর্শস্থল। শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। বুড়ো বয়সেও রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতেন। নিজের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। কাছে রাখতেন একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। অবসর সময়ে তার সঙ্গে খেলা করতেন। কখনও বই পড়ে শোনাতেন, আবার কখনও চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঁদরের বাঁদরামি দেখে উভয়ে হাততালি দিয়ে নাচতেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়। ফ্যারাডের শেষ ইচ্ছা ছিল, তাকে যেন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে সমাধিস্থ করা হয় এবং একমাত্র আত্মীয়স্বজন ব্যতীত কেউ যেন উপস্থিত না থাকেন। তাঁর শেষ ইচ্ছার বিরোধিতা করেননি কেউ। তবে বহু গুণমুগ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি দূরে গাছের আড়ালে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ফ্যারাডের শেষকৃত্য। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন গাছের আড়াল থেকে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাঁদের একান্ত প্রিয় বিজ্ঞানীর প্রতি।

ফ্যারাডের জন্মশতবার্ষিকীতে লণ্ডনের এলবার্ট হলে এক বিরাট

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবার পুরোভাগে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল ফ্যারাডের সেই কয়েক পাক তামার তার জড়ান একটি সলিনয়েডের কুণ্ডলী, একটি চুম্বক এবং কতকগুলি লোহার টুকরো। বলা বাহুল্য, দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ঐ সব স্থূল যন্ত্রপাতিগুলিই।

বিজ্ঞানীদের আদর্শ ছিলেন মাইকেল ফ্যারাডে অধ্যবসায় থাকলে মানুষ যে কত বড় হতে পারে তার একমাত্র উদাহরণ তিনিই। স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ না করে কেবল ঘরে বসে বই পড়ে পড়ে এবং ডভির বক্তৃতা শুনেই তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন—ঠিক যেন একলব্যের সাধনা।

আমাদের ছেলেমেয়েরা, যারা বিজ্ঞানের বই পড়তে ভালবাসে না এবং বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো দেখলে আঁৎকে ওঠে তারা যেন একবার স্মরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর সেই মহান বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডেকে।

স্যামুয়েল মোর্স

[জন্ম- ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ।]

টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তারূপে জগতে অমর হয়ে আছেন স্যামুয়েল মোর্স। অথচ চিত্রকর হিসাবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি। খ্যাতিলাভও করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে। কথিত আছে, লণ্ডনের একটি বড় প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্বর্ধিত করেছিল স্বর্ণপদক দান করে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি তারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঙ্কেত প্রেরণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। অবশেষে কৃতকার্য হয়ে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন মোর্স।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ম্যাসাচুসেটসের চালসটাউন নামক একটি স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন স্যামুয়েল মোর্স। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি চিত্রকরের কাজ বেছে নেন। কথিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইউরোপে এবং বিভিন্ন যাদুঘরগুলি থেকে লাভ করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা। প্রায় চার বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে শেষে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে।

দেশে ফেরার পথে জাহাজেই আলাপ হয় একজন চিকিৎসকের সঙ্গে। চিকিৎসক কিন্তু চিকিৎসা অপেক্ষা গবেষণা করতেই ভালবাসতেন। বিশেষ করে চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে তাঁর ছিল ভয়ানক আগ্রহ। তাই হাতের কাছে সবসময় মজুত থাকতো চুম্বক ও বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি। চিকিৎসক সেই জাহাজেই মোর্সকে কতকগুলি পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন এবং বিদ্যুৎ ও তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণের কথা আলোচনা করেছিলেন। ফলে মোর্সের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কেউ কেউ আবার মনে করেন, মোর্সের যেমন ছিল শিল্পীমন তেমনই ছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। সে সময় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। শিল্পী স্যামুয়েল মোর্সও তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতেন। পরিশেষে তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণের জন্য এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেন যে ছবি আঁকতে আর সুযোগ পাননি।

নিজের চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে মোর্সকে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই সময় তাঁকে বরণ করতে হয়েছিল কঠোর দারিদ্র্যকে। তবুও পরাজয় স্বীকার করেননি তিনি। শোনা যায়, অর্থাভাবে শেষের দিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও কিনতে

পারতেন না। নিজ হাতেই তাঁকে তৈরি করে নিতে হতো যান্ত্রিক সরঞ্জাম।

সুদীর্ঘ চার বছর কাল আক্লান্ত পরিশ্রমের পর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন স্যামুয়েল মোর্স। জগৎ জানতে পারল, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদশীর্ষ থেকে ৬০০ গজ দূরে তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সেদিন।

কিন্তু মোর্সের গবেষণা ঐখানে থেমে গেল না। তিনি চাইলেন আরও দূরে—বহু দূরে সঙ্কেত প্রেরণ করতে। শেষে আবিষ্কার করলেন "রিলে" পদ্ধতি। এবার দূরে সঙ্কেত প্রেরণের আর কোন অসুবিধা রইল না।

আনন্দিত মোর্স সরকারের কাছে আবেদন রাখলেন, কিছু অর্থ সাহায্য করলে তিনি ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত তারের মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খবরের আদান প্রদান করতে পারেন। তাঁর এই শুভ ইচ্ছাকে স্বাগত জানালেন সরকার। মোর্স লাভ করলেন প্রচুর সাহায্য। অবশেষে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত লাইন টেনে নিয়ে স্যামুয়েল মোর্স খবরের সঙ্কেত প্রেরণ করলেন। পৃথিবীতে সেই প্রথম প্রবর্তিত হলো টেলিগ্রাফ। ঐ দিনই মনুষ বধ করল দূরত্বকে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সংযোজিত হলো একটি নতুন অধ্যায়। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল স্যামুয়েল মোর্সের নাম।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল এই মহান বিজ্ঞানী ও চিত্রকরের জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাঁর অবদান।

স্যার চার্লস হুইটস্টোন

[জন্ম —১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু —১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের গ্লসেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন চার্লস হুইটস্টোন। তার পিতা ছিলেন নামকরা এক সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি নির্মাতা। শিক্ষালাভের পর হুইটস্টোন পিতার নিকট ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

একুশ বছর বয়সের সময় হুইটস্টোন হয়ে উঠেন দক্ষ কারিগর ও সঙ্গীত শিল্পী। যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের জন্য কাকার সঙ্গে এলেন লণ্ডন শহরে। কিন্তু ঘরে ফিরে গেলেন না হুইটস্টোন। লণ্ডন শহরেই বসবাস করে যন্ত্রপাতি নির্মাণ আরম্ভ করলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা। মাত্র কয়েক মাস পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন একটি গবেষণাপত্র। তাছাড়া জনসমক্ষে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর পরীক্ষাও প্রদর্শন করেছিলেন। সেই সব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন, শব্দতরঙ্গকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে প্রেরণ করতে।

হুইটস্টোনের মূল্যবান পরীক্ষাগুলি তৎকালীন ইংলণ্ডের নামকরা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি বিশিষ্ট শব্দবিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তখন তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে লণ্ডনের কিংস কলেজ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য। হুইটস্টোন সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না। যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ পরিত্যাগ করে অধ্যাপনা ও গবেষণায় মেতে উঠলেন।

হুইটস্টোনের একটি বড অবদান, তিনিই সর্বপ্রথম তারের মাধ্যমে কতকগুলি সঙ্কেত একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই পরীক্ষাকে ভিত্তি করে টেলিগ্রামের সূচনা হয়েছিল এবং বহু বিজ্ঞানীকে পরীক্ষাটি অনুপ্রাণিত করেছিল।

হুইটস্টোন অনেকগুলি যন্ত্রের উদ্ভাবক। সাধারণ মানের রোধ পরিমাপের নীতি তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন. নীতিটি তড়িৎ-বিজ্ঞানে হুইটস্টোনের নীতি নামে পরিচিত। তাঁর ঐ নীতিটিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরের দিকে আবিষ্কৃত হয়েছে মিটার ব্রিজ এবং পোষ্টঅফিস বক্স। রিওস্ট্যাট নামক যন্ত্রটিও হুইটস্টোনের আবিষ্কার। তাছাড়াও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি তাঁর নামকে বহন করে আসছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর প্যারিসে হুইটস্টোন পরলোক গমন করেছেন।

হেরমান গুণথের গ্রাসমান

[জন্ম—১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হেরমান গুণথের গ্রাসমান। তবে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ হিসাবে তিনি অধিক পরিচিত। তাছাড়া তাঁর মত ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতও পৃথিবীতে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। ভারতবাসীও ঐ কারণে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে গ্রাসমানের নাম।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বাল্টিক সাগরের উপকূলে স্টেটিন নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন হেরমান গ্রাসমান। তাঁর পিতা ছিলেন গণিতের একজন নামকরা অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত গণিতবিদ। পুত্রকে তাই অতি ছোটবেলা থেকেই গণিতে শিক্ষাদান করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় গ্রাসমান অতি অল্প বয়সে উচ্চতর গণিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে গ্রাসমান অধ্যয়ন করেন বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। মাত্র আঠার বছর যখন তাঁর বয়স, সেই সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের তিন বছরের পাঠক্রম সমাপ্ত করে ফিরে আসেন স্টেটিনে। তারপর আরম্ভ করেন গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি শিক্ষা। প্রায় চার বছর কাল তিনি বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন এই কাজে। পরিশেষে প্রাচীন ভাষাগুলিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে একটি বিদ্যালয়ে গ্রীক, লাতিন ও গণিতের শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিদ্যালয়ে কাজ করার পর তিনি বার্লিন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন কাজ করেননি। অল্পদিন পরে বার্লিনের প্রসিদ্ধ ওটো স্কুলে গণিতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় বাস করেন এইখানেই।

গ্রাসমান ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন নামকরা গণিতজ্ঞ। গণিত সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাগুলি অবশ্য তিনি ইচ্ছা করেই জীবদ্দশায় প্রচার করেননি। মৃত্যুর পর তাঁর সমূহ গবেষণামূলক প্রবন্ধ একখানি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় এবং সর্বত্র সমাদর লাভ করে। গ্রাসমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তিনি বিন্দু, রেখা ও তলের বিশ্লেষণে ক্যালকুলাস প্রয়োগের সূত্রপাত করেন। বীজগণিতের উপরও আছে তাঁর অসামান্য দান। গ্রাসমানের অবদানকে স্মরণ করে অনেকে তাঁকে আধুনিক বীজগণিতের অন্যতম প্রবর্তকরূপে স্বীকার করে থাকেন। গ্রাসমানের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর

গবেষণাবলীকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে "ভেক্টর বিশ্লেষণ"।

ভাষাতত্ত্বেও গ্রাসমানের দান বড় কম নয়। যে সমস্ত বিদেশী ভারতকে ভালবেসেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষা চর্চা করেছিলেন গ্রাসমান তাঁদের অন্যতম। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই সূত্রানুসারে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। সূত্রটি আজও "গ্রাসমান ল" নামে ভাষাতত্ত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে।

গ্রাসমান ভারতীয় বেদ বেদান্ত সম্বন্ধেও দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। তিনি ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশ করে ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। "ভেরটের বুখৎস্থুম ঋগ্‌বেদ" বা ঋগবেদের অভিধান রচনাও তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় কীর্তি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর এই প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও গণিতজ্ঞ পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত হারিয়েছে তার এক অকৃত্রিম বন্ধুকে।

চার্লস ডারউইন

[জন্ম—১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।]

জীববিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক রূপে চার্লস ডারউইন অমর হয়ে আছেন। তাঁর মতবাদ জীবনের রহস্য বিশ্লেষণ করতে এবং সৃষ্টির মূল নিয়মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করেছে। তাই জীববিজ্ঞানে একটি বড় স্থান অধিকার করে আছেন ডারউইন। জীব বিজ্ঞানীদের মতে ডারউইন সর্বপ্রথম

উপলব্ধি করেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল। তিনিই প্রথম অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে "প্রাকৃতিক নির্বাচন" নামক সূত্রটি নির্বাচন করেন। জীববিজ্ঞানে তাই গুরুস্থানীয় চার্লস ডারউইন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ডারউইন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। বিশ্বপ্রকৃতির রূপরাশি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন বালক ডারউইন। বুঝিবা আমাদের চারপাশের জীব ও উদ্ভিদরা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই তরুণ মনেই উদিত হয়েছিল জিজ্ঞাসা, এরা এসেছে কোথা থেকে আবার যায়ই বা কোথায়? এদের কী কোন অস্তিত্ব থাকে না পৃথিবীতে?

চার্লস ডারউইনের পিতামহ এরসমাস ডারউইনও ছিলেন বিখ্যাত নিসর্গবিদ্, বিজ্ঞানী ও লেখক। হয়ত পিতামহের প্রভাবও পড়েছিল বালকের উপর। বিশ্বজগৎ ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও জেগেছিল তাঁর বাল্য বয়সে।

ভাবুক ও নিসর্গপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও ডারউইন বরাবরই লেখা-পড়ায় ছিলেন ভাল। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলিতেও রেখেছিলেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। একটু বয়স হতেই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ তাঁর আরও বেড়ে যায়। অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে। যেখানে সেখানে ছুটতেন। বিভিন্ন স্থানের জীবজন্তু এবং গাছপালা সম্বন্ধে চিন্তাও করতেন। পরিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

একটা সুযোগও এসে গেল ডারউইনের জীবনে। সেই সময় এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল নামে একটি ভ্রাম্যমাণ জাহাজের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একজন নিসর্গবিদের। ডারউইন সংবাদটি শ্রবণ করেই হৃষ্টমনে ছুটে গেলেন জাহাজেন ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিযুক্ত করলেন নিসর্গবিদ হিসাবে। তবে এই পদটি ছিল অবৈতনিক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের গাছপালা ও জীবজন্তু দর্শনের জন্য ডারউইন এত বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন যে অবৈতনিক পদেও আপত্তি করেননি।

বিগ্‌ল জাহাজটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দিকে যাত্রা করে। সুদীর্ঘ ছ'বছর কাল জাহাজটি পরিভ্রমণ করেছিল দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং "গালা পাগস" প্রভৃতি নানা আগ্নেয়গিরি সঞ্জাত দ্বীপপুঞ্জে। এই ছ'বছর পরিভ্রমণের পর ডারউইন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এবার আরম্ভ করেন গবেষণা। সে গবেষণা অব্যাহত ছিল সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে। তাছাড়া ঐ সময়ে বহু পুস্তকও পাঠ করেছিলেন ডারউইন এবং যখন তখন বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে পরীক্ষা করতেন জীবাশ্মগুলিকে।

অবশেষে ডারউইনের দীর্ঘদিনের সাধনা প্রকাশিত হয় অভিব্যক্তিবাদ বা থিওরি অফ ইভলিউশন নামক কয়েকটি মতবাদের আকারে। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ অভিযোজনের ফলে স্থানোপযোগী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবজগতে বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি হলেও জীবের মোট সংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদকে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামে যারা যোগ্য তারাই কেবল টিকে থাকে, এবং অবশিষ্টেরা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চতুর্থতঃ প্রতিকূল পরিবেশে যারা টিকে থাকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য তাদের অভিযোজনের ফলে উৎপন্ন হয় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। অভিযোজন ক্ষমতার গুণ বা দোষের উপর প্রজাতির অস্তিত্ব ও অবলুপ্তি নির্ভর করে।

উপরের মতবাদগুলি ডারউইন এবং ওয়ালেস নামে আর একজন নিসর্গবিদ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছিলেন। পরে ঐ মতবাদগুলির ব্যাখ্যা ডারউইন নিজেই পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন।

মতবাদগুলি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ইউরোপে প্রচণ্ড বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বহু সমালোচনার পর বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন ডারউইনের মতবাদ। বর্তমানে সেই মতবাদগুলিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং সংশোধন করে নব্য ডারউইন মতবাদ নামে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞান।

ডারউইনের জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে পঠনপাঠন, মনন ও গবেষণায়। বড় দার্শনিক হিসাবেও ডারউইনের সুখ্যাতি আছে। অভিব্যক্তিবাদ প্রকাশের পর থেকে তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করে গেছেন। পুস্তকগুলির মধ্যে "দি অরিজিন অফ স্পিসিজ", "ফার্টিলাইজেশন অফ অর্কিডস", "ভেরিয়েশন অফ প্লান্টস অ্যাণ্ড অ্যানিম্যালস আফটার ডোমেস্টি-কেশন", "ডিসেন্ট অফ ম্যান", "ফর্মেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ দি অ্যাকশন অফ ওয়র্ম" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রতিটি পুস্তকই বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের অত্যন্ত প্রিয়।

ডারউইন ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সরল, নম্র ও উদার। আজীবন তিনি কেবল গবেষণা করে গেছেন। জীবে প্রেম ছিল তাঁর চরিত্রের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান নিসর্গবিদ ও দার্শনিক অমরধামে যাত্রা করেছেন।

হেনরি ভিক্টর রেনোঁ

[জন্ম—১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন হেনরি ভিক্টর রেনোঁ। তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। ছেলেকে ভালভাবে শিক্ষাদান করার আর্থিক সঙ্গতি পিতার ছিল না। ছেলেবেলায় রেনোঁকে একটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করতে পারেননি তিনি। একটু বয়স হতেই পড়াশোনা বন্ধ করে চাকরির অনুসন্ধানে বহির্গত হতে হয়। অবশেষে বহুকষ্টে যোগাড় করেন একটি ওষুধের দোকানের কেরাণীর পদ।

রেনোঁর কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল ভয়ানক। তিনি চাকরি পাওয়ার পর দিনের বেলায় দোকানের কাজকর্ম করতেন আর রাত্রিতে বিদ্যাভ্যাস করতেন। তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল রসায়ন এবং ওষুধ।

কিছুকাল কাজ করার পর যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করে রেনোঁ প্যারিসে গমন করেন। সেখানে ভর্তি হন "একোল পলিটেকনিক স্কুলে।" এই সময় তিনি অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়েন। তবুও মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি রেনোঁর। দ্বিগুণ উৎসাহে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও চালিয়ে গেছেন। এমন অনেক দিন কেটেছে, যেদিন তাঁর কপালে :এক কণাও খাদ্য জোটেনি।

কঠোর পরিশ্রম কোনদিনই ব্যর্থ হয় না। তাই অর্থ সমস্যা রেনোঁকে বাধা দিতে পারেনি। বরং তাঁর জীবনকে আরও মহত্তর করেছিল। একোল পলিটেকনিক থেকে তিনি একদিন কৃতিত্বের সঙ্গে

পাশ করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেন অধ্যাপকের পদ।

রেনোঁ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁর প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তাই অধ্যাপকের পদ লাভ করেও তৃপ্ত হতে পারলেন না। আরম্ভ করলেন গবেষণা। প্রথম প্রথম তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জৈব রসায়ন। এই বিষয়ে তাঁর কিছু কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ কয়েকটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ গুলির মৌলিকত্ব দেখে বিস্মিত হন সুধীমণ্ডলী এবং রেঁনোও খ্যাতি লাভ করেন বিজ্ঞানী হিসাবে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি একোল পলিটেকানিক স্কুলে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এই সময় থেকে তিনি তাপবিজ্ঞান সম্বন্ধে আরম্ভ করেন গবেষণা। পদার্থবিদ্যার এই বিভাগেই রেনোঁ রেখে গেছেন তার অসামান্য অবদান। বহু যন্ত্র ও তথ্যের আবিষ্কর্তা তিনি। সেইগুলির মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় বিশেষ এক ধরনের ক্যালার মিটার। এখনও ল্যাবরেটারিতে কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করতে হলে রেনোঁর ক্যালরি মিটারকে ব্যবহার করতে হয়। বায়ুর শিশিরাঙ্ক ও আপেক্ষিক আদ্রতা নির্ণয়ের জন্য যে হাইগ্রোমিটারগুলি ব্যবহার করা হয় তাদের একটির আবিষ্কতা রেনোঁ। হাইগ্রোমিতিতে রেনোঁর হাইগ্রো মিটারের গুরুত্বই সবাধিক। তাছাড়া জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব, গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ প্রভৃতিও রেনোঁ যন্ত্রের দ্বারা নির্ণয করে গেছেন এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে তারই পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ সম্বন্ধেও রেনোঁ গবেষণা করেছিলেন। এই বিষয়গুলিতেও তাঁর আছে অসামান্য দান। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাপবিজ্ঞানের একটি বড় অংশের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী রেনোঁ এবং তাঁরই আবিষ্কারের ভিত্তিতে তাপবিজ্ঞান এত দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পেরেছে।

শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও রেনোঁ দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা শব্দের গতিবেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায়ও রেনোঁর কিছু কিছু অবদান আছে।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়েছে।

একমাত্র অধ্যবসায়ের বলে মানুষ যে কত বড় হতে পারে তার প্রমাণ হেনরি ভিক্টর রেনোঁ। তিনি ছিলেন আত্মভোলা ও নিরহঙ্কারী। অনাড়ম্বর জীবনই তিনি ভালবাসতেন। পরবর্তীকালে সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করেও তাঁর জীবনযাত্রার মান এতটুকু পরিবর্তন করেননি। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন এবং দারিদ্র্যই ছিল তাঁর চির সহচর।

গালোয়া এভারিস্ত

[জন্ম—১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্ববন্দিত সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে গালোয়া এভারিস্ত অন্যতম। গালোয়া একদিকে যেমন শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনই জীবনটাও ছিল তাঁর অত্যন্ত ঘাতপ্রতিঘাতময়। প্রাণ হারাতেও হয়েছে তাঁকে অতি অল্প বয়সে। তবুও উচ্চতর গণিত কোনদিন ভুলতে পারবে না গালোয়াকে।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন গালোয়া। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। বিপ্লবী হিসাবেও তিনি বিরাগভাজন হয়েছিলেন অনেকের কাছে। তাই

চেষ্টা করেও উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ হন গালোয়া। অবশেষে বহু চেষ্টায় তিনি ভর্তি হয়েছিলেন "একোল নর্মাল স্কুলে"। সেখানেও তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ। ফলে গালোয়াকে বিতাড়িত করা হয় বিদ্যালয় থেকে। এর পরে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি। ঘরে বসে বসেই গণিতের চর্চা আরম্ভ করেন। রাজনীতি এবং বিপ্লবের পথ অবশ্য তিনি পরিহার করেননি কোনদিনই। যেন রাজনীতির একটা ভয়ঙ্কর নেশা ছেলেবেলা থেকে তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

বিপ্লবী গালোয়া এভারিস্ত চাকরির সংস্থানও করতে পারেননি। শেষে এক ধনী ব্যক্তি তাঁর পুত্রের জন্য গালোয়াকে নিযুক্ত করেন গৃহশিক্ষক হিসাবে। ঐ সামান্য রোজগারই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তাঁকে এই চাকরিও ছাড়তে হয়। পরিশেষে তিনি যোগদান করেন ফ্রান্সের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলে। ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে কারাবরণ করতে হল। কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করার পর মুক্তিলাভ করেন গালোয়া। কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে পুনর্বার যোগদান করেন বিপ্লবী দলে।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র একুশ বছর। জনৈক মহিলার প্রেমকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কিন্তু প্রেমের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত ও নিহত হলেন গালোয়া।

গালোয়া ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী এবং বীর বিপ্লবী। জীবনে ভয় কাকে বলে কোনদিনই জানতেন না। বিপ্লবী হিসাবেই জীবদ্দশায় পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আর একটি গুণ ছিল তাঁর। সেটি তাঁর গাণিতিক প্রতিভা। বিপ্লবের পথকে যেমন তিনি বেছে নিয়েছিলেন তেমনই গণিতের গবেষণায় লাভ করতেন পরম তৃপ্তি। তাই মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গণিতের নানান তথ্য। সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন নিজের

ডায়েরীতে। কোন আবিষ্কার তিনি প্রকাশ করেননি তাঁর জীবদ্দশায়। তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলি পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে। গালোয়ার মৃত্যুবরণ সংবাদ শ্রবণ করার পর বন্ধুটি তাঁর গবেষণাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম প্রথম গালোয়ার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশের কোন সুযোগ হয়নি। তার মৃত্যুর প্রায় চৌদ্দ বছর পরে প্রকাশিত হয় সেগুলি। কথিত আছে, এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে কিছু কিছু প্রবন্ধ হারিয়েও গেছে চিরতরে। তবুও যা পাওযা গেছে তাও বড় কম নয়।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ধারাবাহিকভাবে গালোয়ার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সেই থেকে নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করেন তাঁর স্বদেশবাসী। সবাই স্বীকার করেন, গালোয়ার গাণিতিক প্রতিভা ছিল অসামান্য এবং গালোয়ার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি গণিতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন তার তত্ত্বগুলি গবেষণার বিষয়বস্তুও হয়েছিল অনেকের কাছে।

গণিতজ্ঞদের বিচারে গালোয়া চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সমীকরণের বীজতত্ত্বের আবিষ্কারক হিসাবে। গণিতে তাঁর আবিষ্কারকে স্মরণীয় করার জন্য সসীম ফিল্ডকে "গালোয়া ফিল্ড" এবং সমীকরণের বীজের রূপকে "গালোয়া সংযোগ" নামে অভিহিত করা হয়।

মৃত্যুর চৌদ্দ বছরেরও বেশি সময় পরে গালোয়া তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেছেন। দুঃখ করেছেন বিজ্ঞানীরা, এমন এক প্রতিভাধরের অঙ্কুরে বিনাশ হয়েছে বলে।

রবার্ট উইলিয়ম বুনসেন

[জন্ম—১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

রসায়নাগারে কাজ করতে গেলে প্রায়ই কোন না কোন জিনিসকে গরম করার প্রয়োজন হয়। রান্নার জন্য উনান যেমন অপরিহার্য তেমনই অপরিহার্য রসায়নাগারে বুনসেন দীপ। এই দীপটিকে জ্বালান হয় কোল গ্যাসের দ্বারা। বুনসেন দীপের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, দীপনলের নিম্নভাগের ছিদ্রকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে খুলে বা বন্ধ করে দীপনলের ভেতর বায়ুর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে অদীপ্ত ও দীপ্ত এই দুই ধরণের শিখা পাওয়া যায়।

এই দীপের আবিষ্কর্তা রবার্ট উইলিয়ম বুনসেন নামে জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী। তাঁরই নামানুসারে দীপটির নাম হয়েছে বুনসেন দীপ।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রবার্ট বুনসেন। রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর আবিষ্কৃত বুনসেন বার্নারের এমন বৈশিষ্ট্য যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি রসায়নাগারে জ্বালান হয় তাঁরই বাতি। মৌলিক পদার্থগুলির সম্বন্ধেও তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে "রুবিডিয়াম" ও "সেরিয়াম" নামক দুটি মৌলিক পদার্থ। বর্ণালীবিদ্যার ক্ষেত্রেও আছে তাঁর মূল্যবান গবেষণা। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন তিনি।

জেমস প্রেসকট জুল

[জন্ম—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

তাপ ও তড়িৎবিজ্ঞানে "জেমস প্রেসকট জুল" একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বিশেষতঃ তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে তাপের উদ্ভব হয় সেই সংক্রান্ত সূত্র প্রথম তাঁরই আবিষ্কার। সূত্রটি প্রচার করেছিলেন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁরই নামানুসারে তড়িৎ বিজ্ঞানে সূত্রটি "জুলের সূত্র" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারের কাছে সলফোর্ড নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন জুল। তাঁর পিতা ছিলেন সুরা সার তৈরির একটি বড় কারখানার মালিক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি ছিল পিতার আগ্রহ। তাই পুত্রকে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সবপ্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই বাল্যকালে জুলকে তাঁর পিতা বহু পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন তৎকালীন নামকরা বিজ্ঞানী জন ডালটনকে। বালক জুলও এইসব কারণে বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহ গড়ে উঠে সেই ছেলেবেলা থেকে।

কৈশোরে জুল তড়িৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। কথিত আছে, এই সময় তার উপর পড়েছিল ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তড়িৎবিজ্ঞানী ফ্যারাডের প্রভাব। ফ্যারাডের তখন সুনাম পৃথিবীময় তার পরীক্ষাগুলি ভাবিয়ে তুলেছে বিজ্ঞানীদের। দেশে দেশে চলেছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণার নানা উদ্যোগ আয়োজন। জুলও বাদ পড়লেন না। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন গবেষণায়।

জুলের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তাই ব্যর্থ হল না তাঁর গবেষণা। অচিরে আবিষ্কার করলেন তাঁর বিখ্যাত সূত্র। এই

সময় তিনি একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইঞ্জিনের নক্সাও প্রস্তুত করেন। তখনই তাঁর মনে একটা প্রশ্ন আসে, ইঞ্জিনের দ্বারা যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার সময় কতখানি কার্য করে? এই কার্যের পরিমাপের জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কাল এ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন জুল। বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর তিনি প্রকাশ করেন তাপ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নির্ণয় করেই তিনি তাপবিজ্ঞানে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাপবিজ্ঞান তাঁর নামে একটি এককও প্রচলন করেছে। জুল প্রবর্তিত তাপ ও কার্যের সম্বন্ধ নিম্নরূপ—

"এক একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় তাকেই বলা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুল তুল্যাঙ্ক"।

জুল কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতিরও আবিষ্কর্তা। তবে তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে আছেন তাপ ও তড়িৎবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কারের জন্য। তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে শেষের দিকে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

হেলম্যান ভন হেলমোহৎস

[জন্ম—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট জার্মানীর পোটস্ডমে জন্মগ্রহণ করেন হেলমোহৎস। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। আর্থিক সঙ্গতি খুব ভাল না থাকলেও পুত্রের শিক্ষাদানের ব্যাপারে

যত্নের ত্রুটি ছিল না পিতার। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য।

বাল্যকাল থেকে হেলমোহৎসের বিজ্ঞানের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। অতি ছোটবেলায় তিনি বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি অনুকরণে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারতেন। অনেক সময় সেগুলি এত নিখুঁত হতো যে অনেকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতেন বালকের কারিগরি দক্ষতা দেখে। কথিত আছে, বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় হেলমোহৎস একটি খেলনা দূরবীন প্রস্তুত করেছিলেন। সেটি এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক তাঁর কাজের প্রশংসা না করে পারেননি। বালক হেলমোহৎস একবার তাঁর পিতাকে একটা চশমাও তৈরি করে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, চশমার লেন্সগুলি তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর হেলমোহৎস চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর তিনি চিকিৎসকের চাকরি গ্রহণ করেন প্রাশিয়ার সৈন্য বিভাগে। এই সময়ে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পড়াশোনা করেন। তবে প্রথমের দিকে তিনি গবেষণা করেন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন জীবদেহের "নার্ভসেল"। হেলমোহৎসের এই আবিষ্কারে প্রীত হয়ে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিযুক্ত করেন অ্যানাটমির অধ্যাপক হিসাবে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পশুদের চক্ষুনিঃসৃত আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে আরম্ভ করেন অনুসন্ধানকার্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন।

অতঃপর হেলমোহৎস মানুষের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই গবেষণার ফলে প্রথম আবিষ্কৃত হয় মনুষ্যকর্ণের আভ্যন্তরীণ গঠন ও কার্যপ্রণালী। হেলমোহৎসের পরবর্তী গবেষণা অনুনাদকের সাহায্যে শব্দের গুণাগুণ বিশ্লেষণ। এই

পর্যায়ে তিনি স্বরসমৃদ্ধ শব্দকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করেন। তাঁর এই গবেষণাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে পিয়ানো এবং হারমোনিয়াম নামক অতি পরিচিত যন্ত্র দুটি।

শব্দবিজ্ঞানে হেলমোহৎসের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিযুক্ত করেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রূপে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি তড়িৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। বিশেষতঃ ম্যাক্সওয়েল প্রদত্ত "তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ" তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহবোধ করেন বেশি করে। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না 'বিদ্যুৎ পদার্থকণা, না তরঙ্গ?' এই সম্বন্ধে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হেলমোহৎস এক মূল্যবান তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মূল পদার্থমাত্রই অ্যাটম বা পরমাণু দিয়ে তৈরি। বিদ্যুৎ, তা ধনাত্মকই হোক অথবা ঋণাত্মকই হোক তাকেও অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাঙ্গা সম্ভব হবে। সেই অবস্থায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে "বিদ্যুতের অ্যাটম"।

যদিও হেলমোহৎসের তত্ত্ব সেদিন বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি তবুও তার তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণা যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হেলমোহৎস আজীবন গবেষণা করে গেছেন। তাঁর মত নীরব বিজ্ঞানসাধক খুব কমই দেখা গেছে। যশ ও প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কোনদিনই ছিল না। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও যোগদান করেননি। প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

লুই পাস্তুর

[জন্ম—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

গবাদি পশুর এক রকমের মারাত্মক রোগ হতো। রোগটির নাম অ্যানথ্রাক্স। প্রতি বছর হাজার হাজার পশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো। অথচ সে সময় ঐ রোগের কোন প্রতিষেধক চিকিৎসকদের জানা ছিল না। তাই বহু দরদী ও মরমী বিজ্ঞানীকে চিন্তিত করে তুলেছিল এই রোগটা।

কোখ্ নামে ছিলেন এক নামকরা জীবাণুতত্ত্ববিদ। একবার অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত একটি পশুর রক্তকে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বুঝতে পারলেন, অ্যানথ্রাক্স রোগটার পেছনে আছে মারাত্মক এক ধরণের জীবাণুর প্রভাব। কোখ্ জীবাণুকে আবিষ্কার করেন এবং সুস্থ পশুদেহে ঐ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রমাণ করেন, অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণু সুস্থ দেহে কোন প্রকারে প্রবেশ করলেই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। কোখের আবিষ্কার ছিল ঐ পর্যন্তই কিন্তু অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রতিষেধক তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি।

কোখ-এর পরীক্ষার পর একজন বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন ঐ অ্যানথ্রাক্স রোগটা সম্বন্ধে আরও ভালভাবে গবেষণা করার জন্য। কিছুকাল গবেষণার পর ঘোষণা করেন, পরিমিত পরিমাণে অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণুকে সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করালে পশুটি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত না হয়ে উক্ত রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে ঐ রোগের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাবে।

বিজ্ঞানীর এই গবেষণা পশুরোগ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে নিলেন না। আরম্ভ হলো বাদানুবাদ এবং তর্ক। কিন্তু বিজ্ঞানী হার মানলেন না সহজে। পঞ্চাশটি ভেড়াকে নিয়ে সর্বসমক্ষে চালালেন পরীক্ষা।

প্রথমে বিজ্ঞানী পঁচিশটি ভেড়ার দেহে মৃদুভাবে অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে তাদের আলাদা রেখে দিলেন। কেটে গেল কয়েকদিন। তারপর একদিন সমস্ত ভেড়ার দেহেই প্রয়োগ করলেন তীব্র অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণু। এবারও বিজ্ঞানী অপেক্ষা করলেন বেশ কয়েকদিন। অবশেষে দেখা গেল, যে পঁচিশটি ভেড়াকে টিকা দেওয়া হয়নি তারা সবগুলিই মারা গেল একে একে। কিন্তু যাদের টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের একটিও আক্রান্ত হলো না অ্যানথ্রাক্স রোগে।

পৃথিবীতে জয়জয়কার পড়ে গেল বিজ্ঞানীর। মানুষ সেই প্রথম বুঝতে পারল, পরিমিত পরিমাণে কোন রোগজীবাণুকে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে শরীর সেই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই প্রচলিত হল টিকাদানের পদ্ধতি। গবাদি পশুকেও তাই আগে ভাগে টিকা দিয়ে রাখলে আর অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয় না। অ্যানথ্রাক্সের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা দূর হয়েছে ঐ বৈজ্ঞানিকেরই কৃপায়।

সেই মহান বিজ্ঞানীটির নাম লুই পাস্তুর। বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। সারাজীবন ধরে তিনি কেবল জীবাণু সম্বন্ধেই গবেষণা করে গেছেন। আবিষ্কারও করেছেন বহু তথ্য। সত্য বলতে কী, তার মত জীবাণু সম্বন্ধে এত বেশি আবিষ্কার কেউ করতে পারেন নি। এমনকি তাঁর মত এত বড় জীবাণুতত্ত্ববিদও পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ব ফ্রান্সের দোল শহরে জন্মগ্রহণ করেন পাস্তুর। তিনি ছিলেন এক চর্মব্যবসায়ীর পুত্র। পিতার আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। তদুপরি পুত্রের লেখাপড়ার দিকে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পাস্তুর উচ্চশিক্ষা লাভ করুক। পাস্তুরও পিতার অভিলাষ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্কুল ও কলেজ প্রত্যেকটি স্থানে রেখেছিলেন কৃতিত্বের ছাপ।

পরিশেষে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য লাভ করেন ডক্টর উপাধি। অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে।

রসায়নের অধ্যাপক পাস্তুর প্রথম জীবনে রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "রেশমিক অ্যাসিড"। উক্ত পর্যায়ে পাস্তুরের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ তাঁরই গবেষণাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে লিভোটার্টারিক অ্যাসিড নামে একটি জৈব অ্যাসিড। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পাস্তুর জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণার পেছনে আছে বিশেষ একটি ঘটনা।

ফ্রান্স গুটিপোকার চাষ করে। সে বছর গুটিপোকায় ধরল ভয়ানক মড়ক। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সরকারও হলেন চিন্তিত। শেষে পাস্তুরের উপর ভার পড়ল গুটিপোকার মড়কের কারণ এবং তার প্রতিষেধকের উপায় আবিষ্কার করার।

পাস্তুরের নাম ছিল রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে। জীবাণু সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করতেন না। তাই দেশবাসী কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। সরকারের উপর দোষারোপও করলেন কেউ কেউ। কিন্তু পাস্তুর ভীত হলেন না। প্রবল উৎসাহে চালিয়ে গেলেন গবেষণা। অতি অল্প দিনেই আবিষ্কার করলেন গুটিপোকার মড়কের কারণ এবং প্রতিকারের উপায়। দেশবাসী অবাক হলেন পাস্তুরের প্রতিভা দেখে। এতদিনে বুঝতে পারলেন সরকার যোগ্য পাত্রেই ভার অর্পণ করেছিলেন।

অতঃপর পাস্তুর সন্ধানক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ফ্রান্সে আঙ্গুর, বিট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলে ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে মদ রপ্তানি করে বিদেশে। ঐ মদ বেশিদিন থাকলে নষ্ট হয়ে যায় বলে জনৈক মদ্য ব্যবসায়ী ওর কারণ নির্ণয় করতে অনুরোধ করেছিলেন পাস্তুরকে।

মদের উপাদান হচ্ছে সুরাসার বা অ্যালকোহল। কেবলমাত্র আঙ্গুর বা বিট নয়, অন্যান্য ফল, বার্লি, ভুট্টা, চাল এমনকি ঝোলাগুড থেকেও মদ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। অ্যালকোহল তৈরি করতে হলে উপরের যে কোন একটিকে নিয়ে টুকরো-টুকরো করে প্রথমে পচাতে হয়। ফলে গেঁজে ওঠে। পাস্তুরই প্রথম স্থির করেন, ঐ গেঁজে ওঠার মূলে আছে এক ধরনের অদৃশ্য জীবাণুর প্রভাব। শুধু গেঁজে ওঠার ক্ষেত্রে নয়, দুধ টকে দই হয়ে যায়, মাখনের ওপর ছাতা পড়ে, ইত্যাদির মূলেও আছে অদৃশ্য জীবাণুর রহস্য।

পাস্তুর ঐ সব জীবাণুদের সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। বহু ক্ষতিকর জীবাণুনাশের ব্যবস্থাও করে গেছেন তিনি। এই পর্যায়ে তার একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার 'পাস্তুরাইজেশন' নামক পদ্ধতিটি। দুধ সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতিটি আজও বহুদেশে প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, উত্তাপের দ্বারা জীবাণুকে ধ্বংস করে খাদ্যকে বায়ুশূন্য কোন আধারে যদি সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করা যায় এবং খাদ্যবস্তুটিও পচে গেঁজে উঠতে পারে না।

সেই সময় পাউসেট নামে এক বিজ্ঞানী একটি পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, জীবাণুরা স্বয়ংসৃষ্ট। পাস্তুর তার এই ভুলের সংশোধন করেন এবং প্রমাণ করেন জীবাণুরা স্বয়ংসৃষ্ট নয়। ওরা অদৃশ্যভাবে বাতাসে বিচরণ করে। সেই থেকে জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণার একটা নতুন পথের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

পাস্তুরের পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণা অ্যানথ্রাক্স রোগ সংক্রান্ত। গবাদি পশুর অ্যানথ্রাক্স রোগনিবারক টিকা তারই দান। তাছাড়া গৃহপালিত পাখী, মুরগী প্রভৃতির কলেরা রোগের টিকাও পাস্তুরের অবদান।

পাস্তুরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার জলাতঙ্ক রোগের নিরাময়। দীর্ঘদিন গবেষণার পর পাস্তুর স্থির করেন, জলাতঙ্ক রোগটি একধরনের

ভাইরাস ঘটিত এক মারাত্মক ব্যাধি। পাগলা কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতির লালায় এই ভাইরাস বর্তমান থাকে। ওরা কামড়ালে সুস্থ প্রাণীদেহে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং শরীরের নার্ভতন্ত্রকে আক্রমণ করে। সাধারণত দেখা গেছে, পাগলা কুকুর কিংবা শেয়াল কামড়ানোর ১০ দিন থেকে ৭০ দিনের মধ্যে জলাতঙ্ক আত্মপ্রকাশ করে। তখন রোগীর ক্ষতস্থান ফুলে উঠে। গায়ে আসে প্রচণ্ড জ্বর, অযথা ভয় পায় এবং অকারণে ক্রুদ্ধ অথবা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গলার পেশীর সঙ্কোচন ঘটে। ফলে রোগী জলপানে ভীত ও অসমর্থ হয়। তারপর শরীর হয়ে উঠে আড়ষ্ট এবং কর্মশক্তির বিলুপ্তি ঘটে সম্পূর্ণরূপে।

জলাতঙ্ক রোগ আত্মপ্রকাশের মাত্র তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই রোগের প্রতিষেধক এককালে আদৌ ছিল না। দীর্ঘ গবেষণার পর পাস্তুর উক্ত রোগের সিরাম আবিষ্কার করেন এবং প্রথম প্রয়োগ করেন "জোসেফ লিস্টার" নামে একটি বালকের দেহে। স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে বালকটিকে একটা ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়েছিল। পাস্তুর নিজহাতে তাকে সিরাম দিয়েছিলেন। বালকটির আর জলাতঙ্ক হয়নি। সেই দিন থেকেই মানুষের মন থেকে জলাতঙ্ক রোগের ভীতি দূরীভূত হয়েছে।

পাস্তুর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি। তবুও তাঁর অবদানে পুষ্ট হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানই সর্বাধিক। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নব যুগের সূচনা হযেছে পাস্তুরের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। পাস্তুরের অবদানের সত্যই কোন তুলনা হয় না।

ব্যক্তিগত জীবনে পাস্তুর ছিলেন অত্যন্ত নিরলস এবং নিরভিমানী। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা তার কোনদিনই ছিল না এবং নিজেকে অতি সাধারণ বলে মনে করতেন। বিজ্ঞানী হিসাবে জীবদ্দশাতেই তিনি লাভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান। এখন কি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীরূপে।

তাঁর মত নির্লোভও বড় একটা দেখা যায় না। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর যে কোন একটি আবিষ্কারকে পেটেন্ট করে কোটি কোটি মুদ্রা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

বস্তুতঃ পাস্তুরের মত ভূয়োদর্শী যশস্বী বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণ সাধন করেন নি, মনুষ্যেতর প্রাণীরাও তাঁর কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত নয় বর্তমানে কৃষকগণ কৃষিক্ষেত্রে কীটঘ্ন ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সেই কীটঘ্ন ওষুধের আবিষ্কার এবং প্রচলন করেন পাস্তুর। পানীয় জল বিশোধন এবং দুধকে জীবাণুমুক্ত করার বহু পদ্ধতি এখন আবিষ্কৃত হলেও পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অচল হয়নি।

পাস্তুরকে মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। আজ যদি পৃথিবীর মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীর নাম করতে হয় তাহলে তাদের পুরোভাগে পাস্তুরকে স্থান দিতে হবে। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে, এই উদ্দেশ্যে একবার ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছিল, পাস্তুর পেয়েছিলেন সর্বাধিক ভোট। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন নেপোলিয়ন এবং তৃতীয় হয়েছিলেন ভিক্টর হিউগো।

পাস্তুরের স্বদেশবাসী পাস্তুরের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্যারিস শহরের যে জায়গাটিতে তিনি গবেষণা করতেন সেখানে স্থাপন করেছে বিরাট এক মর্মর মূর্তি। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন পাস্তুর আর একটি কুকুর তাড়া করেছে এক মেষপালককে। পাস্তুরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই মর্মর মূর্তি।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে দেহরক্ষা করেছেন পাস্তুর। জীবসেবা যদি ভগবানের সেবা হয় তাহলে পাস্তুরের সেবার কোন তুলনা হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবে তবুও চলবে পাস্তুরের জীবসেবা। পৃথিবীতে যদি সত্যই

কেউ অমর থাকেন তাহলে তিনি পাস্তুর এবং তাঁরই মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন দরদী বিজ্ঞানী। পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন সবাইকে স্বীকার করতে হবে পাস্তুরের ঋণ। তিনি কেবলমাত্র ফ্রান্সের লোক নন, তিনি আমাদের সবার অত্যন্ত আপনার জন।

পাফনুতিই লভোভিচ চেভিশেভ

জন্ম — ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু — ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

বিখ্যাত রুশ গণিতজ্ঞ চেভিশেভ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বোরোভস্ক নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে উচ্চ ডিগ্রি লাভের পর তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গে গমন করেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

গণিতে চেভিশেভের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সবাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। তাছাড়া অঙ্কে তার অন্যান্য অবদানগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে সম্ভবাবাদের সূত্রাবলী, সমাকলন এবং দ্বিপদ রাশিসমূহের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি রেখে গেছেন যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

চেভিশেভ ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কনেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিছুকাল দাঁতওয়ালা চাকা বা গীয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। তার সেই সমস্ত গবেষণার ফল হয়েছে সুদূর-প্রসারী।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চেভিশেভ পরলোক গমন করেছেন। তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল

[জন্ম—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

বংশগতি বিদ্যা বা জেনেটিক্স জীবনবিজ্ঞানের একটি শাখা। বিজ্ঞানীদের মতে পিতা, মাতা অথবা পূর্বপুরুষদের কিছু বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানসন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ পণ্ডিতেরা বলেছেন, মানুষের সন্তান মানুষ, সিংহের বাচ্চা সিংহ, গাধার বাচ্চা গাধা, মুরগীর ডিম থেকে মুরগীর বাচ্চাই পাওয়া যায়। আবার আমের আঁটি থেকে আমগাছ, বকুলের বীজ থেকে বকুল গাছ, মটর থেকে মটর গাছই জন্মায়। বিশ্বের কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আরও দেখা গেছে দুটি মানুষের মধ্যে যেমন আছে বহু সাদৃশ্য তেমনি বৈসাদৃশ্যও অনেকখানি। মুখের গঠন, গায়ের রঙ, ঠোঁট, চোখ, কান, নাক প্রভৃতিতে বেশ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমনও দেখা যায়, সহোদর ও সহোদরাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভাবে থাকে বহু মিল। বিজ্ঞানীরা বহু চিন্তা করে স্থির করেছেন, জীবকোষের নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোজোমের মধ্যে রেখাকারে সজ্জিত যে জিন থাকে, সেই জিনই জীবের সমস্ত দোষগুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। আর যে প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের জিন-এ অবস্থিত পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত দোষগুণ সন্তানসন্ততির মধ্যে প্রকাশ পায় তাকেই বলা হয় বংশগতি বা হেরিডিটি জীবন বিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতি, জিনের গঠন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে সেই শাখাটিকে বলা হয় জেনেটিক্স। গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল জীবন বিজ্ঞান জগতে "জেনেটিক্স-এর জনক" নামে পরিচিত।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মেণ্ডেল অস্ট্রিয়ার ব্রান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষালাভের পর তিনি বন শহরে একটি সন্ন্যাসাশ্রমের ধর্মযাজক

নিযুক্ত হন এবং সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন ঐ আশ্রমেই।

মেণ্ডেল ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করলেও মন ছিল তাঁর সংসার-মুক্ত। তাছাড়া তিনি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মেধার অধিকারী ছিলেন। আর ছিল তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন। যখন যা দেখতেন বা শুনতেন সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতেন তিনি।

আশ্রম সংলগ্ন একটি বাগান ছিল। মেণ্ডেল প্রতিদিন সেখানে বসতেন। একদিন সেই বাগানেই তার চিন্তার উদ্রেক হয়, এক গাছে কেন অন্য ফুল ফোটে না, কেন মানুষের সন্তান মানুষ হয়, কেন এক পাখীর ডিম ফুটে অন্য পাখীর বাচ্চা হয় না? এই "কেন"র উত্তর খুঁজতে গিয়ে মেণ্ডেল সুদীর্ঘ আট বছর ধরে গবেষণা করেন। এই সময়টা তিনি কেবল বাগানের বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সঙ্করায়ন ঘটিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা করেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন স্থানীয় একটি পত্রিকার মাধ্যমে। প্রবন্ধটির নাম ছিল "উদ্ভিদ সঙ্করায়নের ফলাফল।"

প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল বটে, কারও দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হল না। মেণ্ডেল তখন তার গবেষণার ফলাফল "নাগেলি" নামে একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর কাছে লিখে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাগেলিও এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তার কারণও ছিল।

মেণ্ডেলের কিছু পূর্বে ডারউইন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদ। তৎকালীন প্রায় সমস্ত উদ্ভিদ ও জীব বিজ্ঞানীরা ডারউইনের তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন। মেণ্ডেলের নাম আদৌ ছিল না। তাই সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে থাকলেন মেণ্ডেল। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কোন সম্মান বা ন্যূনতম একটা স্বীকৃতিও জীবদ্দশায় তিনি লাভ করতে পারেন নি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মেণ্ডেলের মৃত্যুর পরও কেটে গেল কত দিন। ডারউইনও তখন গত হয়েছেন। প্রায় ষোল বছর পরে বিজ্ঞানী ডি. ভ্রিস বংশগতির উপর পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য জীবের এবং উদ্ভিদের সঙ্করায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সেই সময় খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তিনি বিগত দিনের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। খুঁজতে গিয়ে একদিন তাঁর হস্তগত হয় দীর্ঘকাল আগে প্রকাশিত মেণ্ডেলের গবেষণাবলী। একই সময়ে অস্ট্রিয়ার শেরম্যাক এবং জার্মানির কোরেন্স নামে দুজন বিজ্ঞানীও মেণ্ডেলের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তখন ডি. ভ্রিস, শেরম্যাক এবং কোরেন্স এই তিন জন বিজ্ঞানীই গবেষণা করেন মেণ্ডেল তত্ত্ব সম্বন্ধে। নানা পরীক্ষার পর তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন মেণ্ডেলের তত্ত্বকে। সেই থেকে মেণ্ডেল বিশ্বের বিজ্ঞানের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং খ্যাতি লাভ করলেন "জেনেটিকসের জনক" রূপে।

অধুনা মেণ্ডেলের মতবাদকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে। ঐ পরিবর্তিত মতবাদই "মেণ্ডেলিজম" বা "মেণ্ডেলবাদ" নামে পরিচিত।

উইলিয়ম টমসন কেলভিন

[জন্ম—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ]

বিশ্বের বিজ্ঞানীমণ্ডলে "কেলভিন" একটি অতি পরিচিত নাম। পদার্থবিদ্যার অনেকগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে কেলভিনের নাম যুক্ত। বিজ্ঞান জগতে ইনি লর্ড কেলভিন, টমসন কেলভিন এই দুই নামে পরিচিত। বহু মূল্যবান গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। যতদিন পৃথিবীতে বিজ্ঞানচর্চা থাকবে ততদিন মানুষ ভুলবে না কেলভিনকে।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন স্কটল্যাণ্ডের বেলফাস্টে জন্মগ্রহণ

করেন লর্ড কেলভিন। তাঁর পিতা জেমস টমসন ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। তাই ছেলেবেলা থেকে কেলভিন পিতার কাছ থেকে গণিত ও বিজ্ঞানশিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

বিদ্যালয়ের পাঠশেষে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য টমসন কেলভিন ভর্তি হন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ভর্তি হন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সে সময় ফ্রান্স ছিল বিজ্ঞান চর্চার একটা বড় কেন্দ্রস্থল। কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন শেষে কেলভিন যাত্রা করেন ফ্রান্সে এবং সেখানকার বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণা করে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে। ঠিক সেই সময় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেলভিনকে উক্ত পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং কেলভিন সম্মত হন। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল কেলভিন উক্ত পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন।

কেলভিন অমর হয়ে আছেন তাপগতি বিদ্যায় তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য। উষ্ণতা পরিমাপের জন্য যে "অ্যাবসলিউট স্কেল" বা "পরম স্কেল" ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটির আবিষ্কর্তা কেলভিন। কখনও কখনও আবিষ্কর্তার নামানুসারে ঐ স্কেলকে "কেলভিন স্কেল" বলা হয়ে থাকে।

পরম স্কেলের কল্পনা করে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটিকে তিনি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, থার্মোডাইনামিক্স বা তাপগতি বিদ্যার সাহায্যে এমন একটি স্কেল কল্পনা করা যেতে পারে, যা কোনও পদার্থের কোনও বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করবে না। সেই কল্পনা থেকেই পরম স্কেলের উৎপত্তি।

পদার্থবিদ্যায় কেলভিনের দ্বিতীয় অবদান, গ্যাস তরলীকরণের

সূত্রটি আবিষ্কার। সূত্রটি জেমস প্রেসকট জুল ও টমসন কেলভিন উভয়ে যুগ্মভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তাই সূত্রটি "জুল টমসন এফেক্ট" বা "জুল কেলভিন এফেক্ট" নামে পরিচিত। ওঁদের আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যে বায়ু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি এককালের স্থায়ী গ্যাস রূপে চিহ্নিত গ্যাসগুলিকে তরলে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

আলোক বিদ্যা, বিশেষতঃ আলোকের তড়িৎ চৌম্বক ধর্ম সম্বন্ধে কেলভিন দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। এই পর্যায়েও তাঁর আছে উল্লেখযোগ্য অবদান।

কেলভিনের সময় আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার স্থাপনের জন্য একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। কেলভিন ছিলেন সেই সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা। কথিত আছে, উক্ত কাজে অগ্রসর হতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কেলভিন। শেষে অত্যন্ত সংবেদনশীল গ্যালভানোমিটার আবিষ্কার করে কাজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। নৌচালনা সংক্রান্ত বিবিধ যন্ত্রপাতিও আবিষ্কার করে গেছেন কেলভিন। সেগুলির মধ্যে "টাইডাল অ্যানালাইজার" এবং "টাইডাল প্রেডিকটর" নামক যন্ত্র দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সমুদ্রের গভীরতা মাপক যন্ত্র "ফ্যাদমিটার" কেলভিনেরই আবিষ্কার।

কেলভিন তাঁর মূল্যবান আবিষ্কারগুলির জন্য দেশ বিদেশ থেকে লাভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেছিলেন "নাইট" উপাধি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল "ব্যারণ কেলভিন অফ লার্গজ" উপাধিতে। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে কেবলমাত্র "ফেলো" নির্বাচিত করে সম্মান প্রদর্শন করে নি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কেলভিনকে সভাপতিও মনোনীত করেছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেছিলেন "অর্ডার অফ মেরিট" উপাধি।

কেলভিনের মূল্যবান গবেষণাগুলির অধিকাংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত ৬ খণ্ডে "ম্যাথম্যাটিক্যাল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল পেপারস", ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত "পপুলার লেকচারস অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেজ", ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রকাশিত "মলিকিউলার ট্যাকটিক্স অফ এ ক্রিস্ট্যাল" প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কেলভিন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি ঐ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর স্কটল্যাণ্ডে নিজের জন্মভূমিতে মৃত্যু বরণ করেন তিনি। কেবল ইংলণ্ডের নয়, সকল দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের অন্যতম কেলভিন।

জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

[জন্ম—১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

চুম্বক, তড়িৎ ও তড়িৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্বের উপর যাঁর গবেষণা এককালে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানীর নাম জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। তড়িৎ বিজ্ঞানে তিনি যে সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সূত্রটি "ম্যাক্সওয়েলের কর্ক স্ক্রু সূত্র" নামে প্রসিদ্ধ। এই সূত্রের সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার দিক নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে যে দিকে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করা হয়—উদাহরণ স্বরূপ একটি ডানপাকের কর্ক

স্ক্রুকে পরিবাহী তার বরাবর সেই দিকে ঘোরান হলে হাতের বুড়ো আঙুলটি যে দিকে ঘুরে চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ম্যাক্সওয়েলের এই আবিষ্কারটি তড়িৎ বিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ম্যাক্সওয়েলের যে আবিষ্কারটিকে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে সেটি তড়িৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তরঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম সঠিক ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে অথবা চুম্বক ক্ষেত্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলা ঘটলেই আলোর গতির সমান একটি তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। ঐ তরঙ্গের ধর্মও সাধারণ আলোর ধর্মের মতই। অর্থাৎ আলোকের মত ওদেরও হয় প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পোলারাইজেশন প্রভৃতি.

ম্যাক্সওয়েলের উপরোক্ত মতবাদের যাথার্থ্য যাচাই করতে গিয়েই এক দল বিজ্ঞানী হেনরিক্ হার্ৎস ল্যাবরেটারিতে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন "বেতার তরঙ্গকে"---যা নিঃসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের করেছে গোড়াপত্তন।

বিজ্ঞানীদের মতে, আধুনিক বিজ্ঞান নামক বিশাল মহীরুহটি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি বিশেষ নিয়মের উপর। প্রথম নিয়মটি নিউটনের গতিবিজ্ঞান, দ্বিতীয়টি ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গতত্ত্ব এবং তৃতীয়টি তাপগতি বিদ্যার সূত্রাবলী। ঐ নিয়মগুলির দ্বারাই বিজ্ঞানীরা পার্থিব নিয়ম শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন এবং বহু আবিষ্কারের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান। সেই আবিষ্কারগুলি আবার এক একটি বড় রকমের বিস্ময়। তাই বিজ্ঞানে ম্যাক্সওয়েলের অবদানের কোন তুলনা হয় না।

জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। তবুও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ।

তাই চেয়েছিলেন, পুত্রকে তিনি বিজ্ঞান পড়াবেন।

ম্যাক্সওয়েলের লেখাপড়ার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর পিতা। এমন কি অবসর সময়ে নিজেই বসতেন ছেলেকে পড়াতে। একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে হয়ত পিতার স্নেহের মাত্রা একটু বেশিই ছিল। তথাপি পুত্রের উন্নতির জন্য শাসন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

কিন্তু বাল্যকালে পিতার সব রকমের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। তার একমাত্র কারণ, তিনি ছিলেন ভয়ানক লাজুক। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জা, স্কুলের শিক্ষকমহাশয় এবং সহপাঠিদের সামনে লজ্জা, এমন কি স্নেহশীল পিতার দিকেও তাকাতে তাঁর ছিল লজ্জা। বিব্রত বোধ করলেন পিতা। লজ্জা দূরীভূত হবে বিবেচনা করে ভর্তি করে দিলেন "এডিনবরা অ্যাকাদেমি" নামক একটি ভাল শিক্ষায়তনে। তবুও কিছুতেই কিছু হল না। বছর বছর ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা সার হলো। পিতা এবার সত্যই বড় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে অনেক চিন্তা করে পুত্রকে রাখলেন সব সময় নিজের কাছে। আদালতে গেলে সঙ্গে থাকেন ম্যাক্সওয়েল, সভাসমিতিতে যোগদানের সময় সঙ্গে করেন পুত্রকে, বেড়াতে গেলে—বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হলে হোটেল রেস্তোঁরা সব জায়গায় ম্যাক্সওয়েল। এইভাবে কাটল বেশ কিছুদিন। পিতার চেষ্টা সফল হলো। তের-চৌদ্দ বছর বয়সের সময় ম্যাক্সওয়েলের লাজুক স্বভাব কিছুটা পরিবর্তিত হল। ততদিনে অর্থাৎ বেশ দেরিতে প্রতিভার স্ফুরণ হলো তার।

একদিন স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে ভর্তি হলেন ম্যাক্সওয়েল। পিতা তাঁর জন্য তৈরি করেছিলেন সুন্দর একটি গবেষণাগার। কিশোর ম্যাক্সওয়েলও পিতার উৎসাহে মেতে উঠলেন পড়াশোনা এবং গবেষণায়। মাত্র ষোল বছর বয়সে ম্যাক্সওয়েলের উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন পিতা। যে কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণ

করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল, সেগুলি পিতা একদিন দেখতে দিলেন তৎকালীন একজন নামকরা বিজ্ঞানী "ফোরবীজ"কে। ফোরবীজ সেগুলি দেখে বালকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রেরণ করেন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে। শোনা যায়, রয়েল সোসাইটিও ম্যাক্সওয়েলের প্রশংসা করে সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল।

সতের বছর বয়সের সময় ম্যাক্সওয়েল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাশ করার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বেশ কিছুদিন চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অতঃপর উন্নততর গবেষণার জন্য তিনি যোগদান করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইখানে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর প্রসিদ্ধ "কর্ক স্ক্রু সূত্রটি।" কথিত আছে, কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে ম্যাক্সওয়েল তৎকালীন ইংলণ্ডের সেরা বিজ্ঞানী ফ্যারাডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তড়িৎচুম্বক সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না, অঙ্কশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিংস কলেজ তাঁকে আমন্ত্রণ জানায় এবং ম্যাক্সওয়েলও গ্রহণ করেন এখানকার পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ।

কিংস কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন আলোকের তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গতত্ত্ব। ম্যাক্সওয়েল বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন বলে উক্ত তরঙ্গতত্ত্বের ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর। অবশ্য তৎকালীন বিজ্ঞানীদের ইথার ও আলোক তরঙ্গের ধারণা, বিদ্যুৎ কারেন্ট, ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভৃতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। পরে আলোক তরঙ্গকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সহজ গণিতের পরিবর্তে উচ্চ গণিতের দুটি শাখা 'ভেক্টর' ও 'ক্যালকুলাস' প্রয়োগ করেছিলেন।

ম্যাক্সওয়েলের গবেষণা সেদিন বিজ্ঞানীরা সোজাসুজি মেনে নিতে পারেন নি। চারদিক থেকে উঠেছিল খর তর্কের ঝড়। শেষে সব তর্কের হয় অবসান। ম্যাক্সওয়েলের নামও ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞান জগতে। এবার আমন্ত্রণ এল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনিও কিংস কলেজ পরিত্যাগ করে যোগদান করেন কেম্ব্রিজে।

ম্যাক্সওয়েল কিছুকাল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন। একদা শনিগ্রহের বলয় সম্বন্ধে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ চারদিকে আলোড়ন তুলেছিল এবং উক্ত প্রবন্ধটির জন্য তিনি লাভ করেছিলেন "এডামস্ পুরস্কার"। কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থেরও রচয়িতা ম্যাক্সওয়েল। গ্রন্থগুলির মধ্যে "তাপতত্ত্ব" এবং "পদার্থ গতি" নামক দুখানি গ্রন্থ বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ পরিচিত। তাছাড়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি অ্যাণ্ড ম্যাগনেটিজম" নামক গ্রন্থটি তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

ম্যাক্সওয়েলের জীবনের একটি বড় কীর্তি লণ্ডনে "ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটরি নামক বিখ্যাত গবেষণাগারটির প্রতিষ্ঠা। সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন উক্ত গবেষণাগারটি। এখনও গবেষণাগারটির সুনাম বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে ম্যাক্সওয়েলের। চল্লিশ বছর বয়স অতিক্রমের পরই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবুও গবেষণা এবং পুস্তক রচনায় ভাটা পড়েনি। অবশেষে সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর ৪৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সেদিনটি ছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর।

ম্যাক্সওয়েল দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারলে বিজ্ঞানে হয়ত আরও বহু মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হতো। তবুও যা তিনি দান করে গেছেন তার পরিমাণও বড় কম নয়।

ডেভিড এডওয়ার্ড হাইঘেন্‌স

[জন্ম—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে লণ্ডনে হাইঘেন্‌স জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়সের সময় তিনি পিতার সঙ্গে ভার্জিনিয়ায় গমন করেন এবং সেখানকার সেণ্ট যোসেফ কলেজে ভর্তি হন। অতঃপর এখান থেকে পাশ করে ঐ কলেজেরই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

প্রথম থেকেই যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করতেন হাইঘেন্‌স। কলেজে অধ্যাপনার সময় সত্য আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কথিত আছে, এই যন্ত্রটির তিনি উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং বিশেষ একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন—যার দ্বারা টেলিগ্রাফের সঙ্কেত আপনা হতেই লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো। এ ছাড়াও তিনি কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সেই থেকে হাইঘেন্‌সের নাম বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরাসী সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে গমন করেন প্যারিসে। সেখানে বহু গবেষণাগারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বেশ কিছুকাল গবেষণা করেন।

প্যারিস থেকে হাইঘেন্‌স প্রত্যাবর্তন করে লণ্ডনে আসেন। সেখানে লাভ করেন একটি কলেজের অধ্যাপকের পদ। এইখানে গবেষণাকালে তিনি আবিষ্কার করেন "ইনডাকশান ব্যালেন্স"।

ওয়ারলেস টেলিগ্রাফী সম্বন্ধে গবেষণার পথপ্রদর্শক হাইঘেন্‌স। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে কিছু কিছু সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করতে সক্ষমও হয়েছিলেন তিনি। পরে স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স এবং স্যার জর্জ স্ট্যোকের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা স্থগিত রাখেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন।

জুলিয়ুস ডেডেকিন্ড

[জন্ম—১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ হিসাবে ডেডেকিন্ডকে বিজ্ঞান চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছাত্রজীবনে গণিতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করায় তাঁর পিতা তৎকালীন প্রসিদ্ধ জার্মান গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডরিখ গাউসের কাছে গণিতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গাউসের শিক্ষায় এবং উৎসাহে ডেডেকিন্ডও উত্তরকালে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

ডেডেকিনডের গণিতশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় "বাস্তব সংখ্যাতত্ত্ব" এবং "বীজগণিতীয় সংখ্যাতত্ত্ব" নামক দুটি তত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে এই দুই তত্ত্বই তাঁকে গণিতশাস্ত্রে অমর করে রেখেছে। গণিতশাস্ত্রে অন্যান্য অবদানও তাঁর বড় কম নয়। তিনি মূলদ সংখ্যাসমূহের ছেদ (কাট)-এর সাহায্যে অমূলক সংখ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। তিনিই প্রমাণ করেন, বাস্তব সংখ্যাসমূহ থেকে ছেদের সাহায্যে কেবলমাত্র বাস্তব সংখ্যাই পাওয়া যায়। বীজগণিতে "আইডিয়াল"-এর ধারণার প্রবর্তক তিনিই।

ডেডেকিন্ড তাঁর মূল্যবান গবেষণাগুলি কখনও প্রবন্ধাকারে কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেন। তাঁর রচিত "এসেজ অন দি থিওরি অফ নাম্বার" নামক গ্রন্থখানি অঙ্কশাস্ত্রের একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

ডেডেকিন্ড-এর সারা জীবনের গবেষণা অঙ্কশাস্ত্রকে করেছে সমৃদ্ধতর। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স

[জন্ম—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

যাঁদের গবেষণাকে কেন্দ্র করে আধুনিক পদার্থবিদ্যার গোড়াপত্তন হয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স নিঃসন্দেহে একজন। ক্রুক্‌স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তড়িৎমোক্ষণ নলের ঘটনাবলী পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বায়ু কিংবা কোন গ্যাস তড়িতের অপরিবাহী হলেও সম্পূর্ণরূপে অপরিবাহী নয়। গ্যাস কিংবা বায়ুকে নিম্নচাপে রেখে তার ভেতর দিয়ে তড়িৎমোক্ষণ ঘটালে গ্যাস অথবা বায়ুকে তড়িৎ পরিবাহী করা যায়। বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে ধরা পড়ল, বায়ুর চাপ ক্রমশঃ কমাতে থাকলে বায়ুর পরিবাহিতা একটু একটু করে বাড়ে। পরীক্ষাটির জন্য বিজ্ঞানীরা ৩০ সেন্টিমিটারের মত দীর্ঘ এবং প্রায় ৪ সেন্টিমিটার মত ব্যাসের একটি চোঙাকৃতি শক্ত কাচের নল গ্রহণ করতেন। নলের দুপ্রান্তে দুটি ধাতব তড়িৎদ্বার সীল করে বন্ধ করে দিতেন। নলের ভেতরের বায়ুকে নিষ্কাশন করে নেওয়ার জন্য একটি ছোট ছিদ্র ছাড়া বায়ু প্রবেশ বা নির্গমনের দ্বিতীয় কোন রন্ধ্র থাকতো না। তড়িৎদ্বার দুটোর দ্বারা নলের মধ্যে তড়িৎমোক্ষণ পাঠিয়ে এবং পাম্পের সাহায্যে নলের মধ্যস্থিত বায়ুকে নিষ্কাশিত করে বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সব লক্ষ্য করেছিলেন।

ঐতিহাসিক এই পরীক্ষাটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখনও পরীক্ষাটির আছে যথেষ্ট গুরুত্ব। চোঙাকৃতি নলটিতে যে দুটি তড়িৎদ্বার যুক্ত থাকে সে দুটি আবেশ-কুণ্ডলীর গৌণকুণ্ডলী যুক্ত করে উচ্চ তড়িৎবিভব প্রয়োগ করা হয়। ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যে তড়িৎদ্বারকে যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় ক্যাথোড এবং ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত তড়িৎদ্বারকে বলা হয়

অ্যানোড। দুই তড়িৎদ্বারের ভেতর দশ হাজার থেকে পনের হাজার ভোল্ট বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করেই তড়িৎমোক্ষণ শুরু করা হয়। পাম্পের সাহায্যে নলের মধ্যস্থিত বায়ুকে ৮ মিলিমিটার পারদ চাপের সমান করলে বেগুনী-নীল রঙের লম্বা স্ফুলিঙ্গ এক তড়িৎদ্বার থেকে অন্য তড়িৎদ্বারে যেতে দেখা যায়। বায়ুর চাপ পাঁচ মিলিমিটার পারদ চাপের সমান হলে তড়িৎমোক্ষণ বিন্যস্ত হয় এবং দুটি তড়িৎদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান গোলাপী রঙের আলোক স্তম্ভ অধিকার করে এই স্তম্ভগুলিকে বলা হয় ধনাত্মক স্তম্ভ। বায়ুর চাপকে আরও কমিয়ে ২ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের সমান করলে ধনাত্মক স্তম্ভগুলি ক্যাথোড থেকে কিছুটা সরে আসে এবং ক্যাথোড পাতের চারদিকে একটা নীলাভ আলোর ছটা দেখা যায়। এই আলোকের ছটা এবং ধনাত্মক স্তম্ভগুলির মাঝখানে দৃষ্ট হয় একটি অন্ধকার অঞ্চল। বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে পরীক্ষাটিকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে উক্ত কৃষ্ণাঞ্চলটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে কৃষ্ণাঞ্চলটিকে বলা হয় "ফ্যারাডের অন্ধকার অঞ্চল"।

ফ্যারাডের পর প্লুকার, হিটোর্ফ, গোল্ডস্টেইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নলের মধ্যস্থিত বায়ুর চাপকে আরও কমিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। অবশেষে বিজ্ঞানী ক্রুক্স স্বনির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে নলের মধ্যস্থিত বায়ুকে ০·১ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের সমান চাপে এনে পরীক্ষাটি করতে সক্ষম হন। তিনি আবিষ্কার করেন, উক্ত চাপে ধনাত্মক স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে পড়ে এবং তার পরিবর্তে ছোট ছোট আলোর চাকতির সৃষ্টি হয়। অপরদিকে তখন ঋণাত্মক রশ্মির ছটা ক্যাথোড পাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় আরও একটি অন্ধকার অঞ্চল। পরে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কর্তার নামানুসারে উক্ত অঞ্চলটির নামকরণ করেন "ক্রুক্সের অন্ধকার অঞ্চল"।

পরে ক্রুক্সের পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাম্পের সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন করে নলের বায়ুর চাপকে ০·০১ মিলিমিটার পারদের সমান

চাপে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অবস্থায় সমস্ত নলটাই ক্রুক্সের অন্ধকার অঞ্চল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কেবলমাত্র ক্যাথোডের বিপরীত দিকে কাচের দেওয়াল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল হালকা সবুজ আলোতে। এর কারণ, ক্যাথোড থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার বস্তুকণিকা নির্গত হয়ে প্রচণ্ড বেগে কাচের দেওয়ালে এসে পড়ে। ফলে কাচের দেওয়ালে প্রকাশ পায় সবুজ আলোর দীপ্তি। বিজ্ঞানীরা সেই রশ্মির নামকরণ করেছিলেন 'ক্যাথোড রশ্মি"।

ক্রুক্স সেদিন প্রমাণ করেন, ক্যাথোড রে বা ক্যাথোড রশ্মি শক্তি বহন করে, পাতলা ধাতব পাতকে উত্তপ্ত করতে পারে এবং এই রশ্মির ভরবেগ বা মোমেন্টাম আছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, ক্যাথোড রশ্মি অণুর স্রোত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্রুক্সের সিদ্ধান্ত সেদিন কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। চারদিকে উঠেছিল তর্কের ঝড়। অবশ্য পরের দিকে তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হলেও বিজ্ঞানীরা ক্রুক্সের পরীক্ষাগুলিকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে থাকেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তিনি রয়েল কলেজে রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুকাল প্রসিদ্ধ গবেষক ও অধ্যাপক হফ্ম্যানের অধীনে গবেষণা করার পর ঐ রয়েল কলেজেই যোগদান করেন অধ্যাপক হিসাবে।

ছেলেবেলা থেকে ক্রুক্সের ছিল গবেষণার প্রতি আগ্রহ। রয়েল কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি অজৈব রসায়নের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মূল্যবান আবিষ্কার "থলিয়াম" নামক একটি মৌলিক পদার্থ. কিছু পরে আবিষ্কার করেন সোনা ও রূপাকে তাদের আকরিক থেকে পৃথকীকরণের জন্য "সোডিয়াম অ্যামালগাম প্রসেস" নামে একটি পদ্ধতি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রুক্‌সের আবিষ্কার রেডিওমিটার নামক একটি যন্ত্র। এই রেডিওমিটার প্রস্তুতকালে তিনি টিউবের মধ্যস্থিত বায়ুকে নিষ্কাশন করতে গিয়ে মহা অসুবিধার সম্মুখীন হন। সেই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত আবিষ্কার করেন এক বিশেষ ধরনের বায়ু নিষ্কাশক পাম্প। ঐ পাম্পের সাহায্যে ক্রুক্‌স কোন বদ্ধ নলের বায়ুর চাপকে কমিয়ে বায়ুচাপের দশ হাজার ভাগের এক ভাগে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্রুক্‌স পাম্পটি আবিষ্কারের পর তৎকালীন বিজ্ঞানীদের অতি প্রিয় পরীক্ষা তড়িৎমোক্ষণ নলের ঘটনাবলীর দিকে আকৃষ্ট হন। পরে তাঁরই পথকে অনুসরণ করে আবিষ্কৃত হয় ক্যাথোড রশ্মি। সেই সঙ্গে উন্মুক্ত হয় আধুনিক পদার্থ-বিদ্যার রুদ্ধ দ্বার।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল ক্রুক্‌স লণ্ডনে পরলোক গমন করেছেন। প্রকৃত যুগ সন্ধিক্ষণের বিজ্ঞানী ছিলেন স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স।

স্যার আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল

। জন্ম—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।।

বিশ্বে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার "নোবেল প্রাইজের" কথা সবাই জানে। যিনি এই পুরস্কারটির প্রবর্তন করেছেন, তিনি স্যার আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল। বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম।

আলফ্রেড নোবেল ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর স্টক্‌হলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা ইমানুয়েল নোবেল ছিলেন প্রসিদ্ধ টর্পেডো ও

মাইন নির্মাতা। তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গে চাকরি করতেন। পুত্রও তাঁরই মত কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে নয়। এই কারণে পুত্রকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে নোবেল রসায়নবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং গৃহশিক্ষকদের চেষ্টায় ও পিতার আগ্রহে অতি অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নোবেলকে কোনদিন কোন স্কুল কিংবা কলেজে ভর্তি করা হয়নি। কেবলমাত্র গৃহশিক্ষকগণই তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরে একটু বয়স বাড়লেই পিতা নিজে তাঁকে টর্পেডো ও মাইন নির্মাণের কাজে শিক্ষা দান করেন।

ঠিক সেই সময় কোন একটা কারণে ইমানুয়েল নোবেল চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং সেন্টপিটার্সবুর্গ পরিত্যাগ করে সপরিবারে ফিরে আসেন সুইডেনে। আলফ্রেড নোবেল তখন বড় হয়েছেন। তাঁর রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখে পিতা এবার বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক "জিনিন"-এর উপর পুত্রের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। অধ্যাপক জিনিন বালক নোবেলের রসায়নে গভীর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হন এবং রসায়ন বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেন।

তখন সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে "নাইট্রোগ্লিসারিন" নামক বিস্ফোরক পদার্থটি। ওকে নিরাপদে ব্যবহারের উপায় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী মহলে পড়ে গেছে দারুণ সাড়া। জিনিন-এর উৎসাহে নোবেল ঐ নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিয়েই আরম্ভ করলেন গবেষণা। তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কাইজেলগার নামক এক ধরণের সচ্ছিদ্র মাটির দ্বারা নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষিত করিয়ে আবিষ্কার করলেন সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশল। পরে আরও

গবেষণা করে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই আবিষ্কার করেন নিরাপদ ডিনামাইট।

স্যার আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল সুদীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন ডিনামাইটকে নিয়ে। আবিষ্কার করেছিলেন নানাধরণের ডিনামাইট। পরবর্তীকালে ঐ ডিনামাইট থেকে উপার্জন করেছিলেন প্রচুর অর্থ। বিশাল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশ তিনি দান করে গেছেন মানব কল্যাণে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পারী শহরে একটি উইল রচনা করেন। সেই উইল অনুসারে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আবিষ্কারের জন্য; বিশ্বের সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য এবং বিশ্বশান্তি. এই পাঁচটির প্রত্যেকটির জন্য একটা মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হয়।

নোবেলের উইল অনুযায়ী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে আসছে। পুরস্কার দাতার নামানুসারে পুরস্কারটির নাম হয়েছে "নোবেল পুরস্কার"। পুরস্কারের সমূহ টাকা নোবেল গঠিত তহবিলের সুদ থেকেই পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র একটি সংস্থা থেকে সবগুলি পুরস্কার প্রদান করা হয় না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দুটি প্রদান করে সুইডিশ বিজ্ঞান একাদেমি, চিকিৎসাবিদ্যার পুরস্কার প্রদান করে স্টকহলমের কারোলিন মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করে স্টকহলম সাহিত্য একাদেমি এবং বিশ্বশান্তি বিষয়ক পুরস্কারটি প্রদান করা হয় নরওয়েজিয়ান স্টরটিং কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির দ্বারা।

নোবেল পুরস্কারের মত মোটা অঙ্কের পুরস্কার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এই পুরস্কারটি দাতার নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোনো জাতির মানুষ লাভ করতে পারে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রদান করা হয়েছিল এই পুরস্কার। যদিও নির্বাচন করা হয়েছিল তার পূর্ববর্তী বৎসরে। যাঁরা প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন

তাঁরা হলেন জার্মানীর রন্টগেন (পদার্থবিদ্যা), হল্যাণ্ডের ভান্ট হফ (রসায়ন), জার্মানীর ফন বেরিং (চিকিৎসা বিদ্যা), ফ্রান্সের সুলি প্রুধোম (সাহিত্য) এবং সুইটজারল্যাণ্ডের ডুনান্ট ও ফ্রান্সের পাসি (শান্তি)। কোন বছর কোন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়া গেলে সেই বছর সেই বিষয়ে পুরস্কার প্রদান বন্ধ থাকে। এক বিষয়ের পুরস্কার একাধিক ব্যক্তিকে ভাগও করে দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য এই সব ব্যাপারে নোবেলের উইলের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে পরবর্তীকালে।

ভারতবর্ষ থেকে এই পুরস্কার লাভ করেছেন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পদার্থবিদ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ এবং বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। এই প্রসঙ্গে আরও দুজনের নাম করা যেতে পারে। একজন ইংরাজ সন্তান স্যার রোনাল্ড রস—যাঁর জন্মস্থান এবং কর্মস্থান ছিল ভারতবর্ষ। আর একজন প্রখ্যাত সমাজসেবিকা এবং বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক সন্ন্যাসিনী মাদার টেরেসা। ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্য পুরস্কারটি লাভ করেছেন মাদার টেরেসা।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর স্যার আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল পরলোকগমন করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় নোবেল পুরস্কার কাউকে প্রদান করা হয়নি।

বিজ্ঞানের রাজ্যে "নোবেল" চিরকালই অমর হয়ে থাকবেন।

মেণ্ডেলিয়ভ

[জন্ম—১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ।]

রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির অনেকের মধ্যে আছে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের বিশেষ সামঞ্জস্য। সেই থেকে বিজ্ঞানীরা ধর্মের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে মৌলিক পদার্থগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করতে সচেষ্ট হন। প্রথমে তারা মৌলিক পদার্থদের ধাতব ও অধাতব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট না হওয়ায় বিজ্ঞানীরা অন্যভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী "ডোবেরিনার" ত্রয়ী সূত্রের প্রচলন করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে সব মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে মিল আছে তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। ডোবেরিনারের ত্রয়ী সূত্র কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সমস্ত মৌলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলো না।

তারপরে আরও কতকগুলি প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। শেষে 'নিউল্যাণ্ড' নামে এক বিজ্ঞানী ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন তাঁর অষ্টক সূত্র। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, মৌলিক পদার্থগুলিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক গুরুত্বের ভিত্তিতে সজ্জিত করলে একটি নির্দিষ্ট মৌল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অষ্টম সংখ্যক মৌলটির ধর্ম হবে প্রথম মৌলটির মত। অর্থাৎ প্রতি অষ্টম মৌলে ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু তাঁর এই সূত্র বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখা গেল একমাত্র লিথিযাম থেকে ক্যালসিয়াম পর্যন্ত মৌলিক পদার্থগুলিকে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে সজ্জিত করলেই সুফল পাওয়া যায়। পরবর্তী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হয় না।

নিউল্যাণ্ডের পরেও চলে বহু প্রচেষ্টা। অবশেষে বিজ্ঞানীদের

আশা বহুলাংশে সফল করেন প্রসিদ্ধ রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিয়ভ পর্যায় সূত্র আবিষ্কার করে। এই একটি মাত্র কীর্তির জন্য তিনি বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন মেণ্ডেলিয়ভ। জীবন আরম্ভ করেন রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে। মৌলিক পদার্থগুলির ধর্ম সম্বন্ধে নিউল্যাণ্ডের গবেষণা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। অবশেষে ছাত্রদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত পর্যায় সূত্র।

কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে মেণ্ডেলিয়ভের পর্যায়সূত্রের কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। তবুও রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণাকে কেন্দ্র করে এসেছে একটা নতুন যুগ। তিনি বহু মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রসায়ন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন সেই সব মৌলিক পদার্থকে। তাছাড়া মৌলিক পদার্থগুলির ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায় তাঁরই আবিষ্কার থেকে। যদিও মেণ্ডেলিয়ভ হাইড্রোজেনের স্থানকে তাঁর টেব্‌ল-এ সুনির্দিষ্ট করেন নি এবং বিরল মৃত্তিকা মৌলগুলির জন্যও কোন উপযুক্ত স্থানের নির্দেশ দান করেন নি। তাছাড়া হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির জন্যও তাঁর ভবিষ্যৎবাণী ছিল না।

ত্রুটি সত্ত্বেও মেণ্ডেলিয়ভের গবেষণাকে ঐতিহাসিক আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মেণ্ডেলিয়ভের পর্যায়চক্র পরের পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করা হলো।

মেণ্ডেলিয়ফের পর্যায়চক্র (১৮৯৮ সাল)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
লিথিয়াম (Li-7·03)	বেরিলিয়াম (Be-9·03)	বোরোন (B—10·95)	কার্বন (C—12·0)	নাইট্রোজেন (N-14·04)	অক্সিজেন (O—16·0)	ফ্লোরিন (F—19·06)	
সোডিয়াম (N-23·04)	ম্যাগনেসিয়াম (Mg 24·3)	অ্যালুমিনিয়াম (Al 27·1)	সিলিকন (Si 28·4)	ফসফরাস (P 31·03)	সালফার (S 32·1)	ক্লোরিন (Cl 35·45)	
পটাশিয়াম (K 39·11) কপার (Cu 63·6)	ক্যালসিয়াম (Ca 40·1) জিঙ্ক (Zn 65·4)	স্ক্যাণ্ডিয়াম (Sc 44·1) গ্যালিয়াম (Ga 69·9)	টাইটেনিয়াম (Tl 48·2) জার্মেনিয়াম (Ge 72·5)	ভ্যানাডিয়াম (V 51·4) আর্সেনিক (As 75·0)	ক্রোমিয়াম (Cr 52·14) সেলেনিয়াম (Se 79·0)	ম্যাঙ্গানিজ (Mn 55·0) ব্রোমিন (Br 80·0)	আয়রন (Fe 56·0) কোবাল্ট (Co 58·9) নিকেল (Ni 59·1)
রুবিডিয়াম (Rb 85·4) সিলভার (Ag 107·9)	স্ট্রনসিয়াম (Sr 87·6) ক্যাডমিয়াম (Cd 112·0)	ইট্রিয়াম (Y 89·0) ইণ্ডিয়াম In 113·9)	জিরকোনিয়াম (Zr 90·4) টিন (Sn 119·1)	নিওবিয়াম (Nb 93·7) এন্টিমনি (Sb 120·4)	মলিবডেনাম (Mo 96·0) টেলুরিয়াম (Te 127·5)	— আইওডিন (I—126·9)	রুথেনিয়াম (Ru 101·7) রোডিয়াম (Rh 103·0) প্যালেডিয়াম (Pd 106·4)
কেসিয়াম Cs 132·9) —	বেরিয়াম (Ba 137·4) —	ল্যান্থানাম (La 138·6 ইটারবিয়াম (Yb 173·0)	সেরিয়াম (Ce 140·2) — —	— ট্যানটালাম (Ta 182)	— টাংস্টেন (W 184·0)	— —	অসমিয়াম (OS 191·0) ইরিডিয়াম (Er 193·1) প্লাটিনাম (Pt 194·8)
গোল্ড (Au 197·2) —	মার্কারি (Hg 200·0) —	থ্যালিয়াম (Ti 204·1) —	লেড-(সিসা) (Pb 206·4) থোরিয়াম (Th [illegible])	বিসমাথ (Bi 208·1) —	— ইউরেনিয়াম (U [illegible])	— —	

যোসিয়াহ্ উইলার্ড গিব্স

[জন্ম—১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ।]

প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে গিব্সের নাম চিরকাল বিজ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নউ হেভেন নামক একটি স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর তিনি প্যারিস যাত্রা করেন পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। কিছুকাল সেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণার পর তিনি বার্লিনে গমন করেন। অবশেষে হাইডেনবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাস গবেষণা করে প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে।

বিদেশে অবস্থানকালে গিব্স-এর কতকগুলি মৌলিক গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং গিব্সও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বিজ্ঞানী হিসাবে। স্বদেশে ফিরে এলে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। গিব্স সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেননি। যোগদান করেন সেখানকার পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে। পরবর্তীকালে এই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সমূহ গবেষণাবলী।

গিব্স-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, ভালভাবে যাচাই না করে, তিনি কোন কিছু প্রকাশ করতেন না। এক একটি বিষয় আবিষ্কারের পরও চলতো তাঁর বছরের পর বছর গবেষণা। তাই তাঁর দ্বারা প্রকাশিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধ হতো অতি উচ্চমানের। যখনই তাঁর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো তখনই অতি সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতেন বিজ্ঞানীরা এবং সচেষ্ট হতেন সত্যতা যাচাই করতে।

গিব্সকে অমর করে রেখেছে "অন দি ইকুইলিব্রিয়াম অফ হেটরজিনিয়স সাবস্টেনসেস" বা "অসম পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা"

নামক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতিও এই প্রবন্ধটির জন্যই। পরবর্তীকালে ঐ একটি প্রবন্ধ বহু বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ওকেই ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হয়েছে "ফেজকল" নামক রাসায়নিক সাম্যের বিখ্যাত সূত্রটি।

গিব্‌স-এর "অসম পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা" প্রবন্ধটি এত উচ্চমানের হয়েছিল যে, প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেছিল। বহু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন প্রবন্ধটিকে অনুবাদ করতে। জার্মান ভাষায় সেটিকে অনুবাদ করেছিলেন প্রসিদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানী "অস্টওয়াল্ট" (যিনি অনুঘটক দ্বারা অ্যামোনিয়াকে জারিত করে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারক)। পরবর্তীকালে গিব্‌স-এর প্রবন্ধ থেকে রসায়নের এক নতুন শাখার উদ্ভব হলে এই অস্টওয়াল্টই তাঁকে "রাসায়নিক শক্তিতত্ত্বের জনক" আখ্যা প্রদান করেছিলেন এবং বিজ্ঞানীরাও মেনে নিয়েছিলেন তার কথা।

গিব্‌স এর গবেষণাপত্রটি ফরাসী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী "লা শাতলিঁয়ে"। তিনিও ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন প্রবন্ধটির। কিছুকাল গবেষণা করে ঘোষণা করেছিলেন "গিব্‌সের প্রবন্ধটি রসায়ন বিজ্ঞানে একটি অমূল্য অবদান"।

আলোকের তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব সম্বন্ধেও গিব্‌স-এর মহামূল্য অবদান আছে। তিনি যা স্থির করেছিলেন তাকে নিয়ে বহু বিজ্ঞানী দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং উদ্ঘাটিত করেছিলেন একাধিক মূল্যবান তথ্য—যা নিঃসন্দেহে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানকে দিয়েছে নতুন ইঙ্গিত।

গিব্‌স তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্‌স-এর সূত্রকে প্রথম প্রয়োগ করে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

পরবর্তীকালে সেই একই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা মীমাংসা করেছেন বহু সমস্যা।

গিব্‌স ছিলেন নীরব বিজ্ঞান সাধক। জীবনে যেমন খুব বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেননি তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ও বদল করেননি। সারা কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বক্তৃতা দেওয়া এবং বিদেশে যাওয়া তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। একাগ্র সাধনাকে বেছে নিয়েছিলেন জীবনের পথ হিসাবে।

জীবনে বহু সম্মানও লাভ করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেছিল এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেছিলেন "কোপলে" পদক।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহানবিজ্ঞানীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

জি. আরমাউএর হ্যানসেন

[জন্ম—১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ।]

কুষ্ঠ নামক দুরারোগ্য ব্যাধিটি অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে যুগপৎ ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে আসছে। সেই আদিকাল থেকে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন এই ব্যাধিটির কারণ এবং তার প্রতিষেধক আবিষ্কারের নিমিত্ত। পৃথিবীর প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলিতে কুষ্ঠের বর্ণনা আছে, চিকিৎসার উপায়ও বর্ণিত হয়েছে কোথাও কোথাও। কিন্তু কুষ্ঠের ভয়াবহতা দূরীভূত হয়নি এতটুকুও। প্রতিবছর পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করার পর একদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

কুষ্ঠরোগের ভয়াবহতা দর্শনে মানুষের মনে কতকগুলি সংস্কারও

দানা বেঁধেছিল। সেই সব সংস্কারের একটি ছিল কুষ্ঠ সংক্রামক ব্যাধি। তাই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেউ সমাজে ঠাঁই দিত না। ফলে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অবর্ণনীয় দুর্দশা ও যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একদিন পথের পাশে অথবা বৃক্ষমূলে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হতো।

আধুনিককালে কুষ্ঠ রোগীদের দুর্দশা দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন কিছু কিছু দরদী ও মরমী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন উক্ত রোগটির প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য। শেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন জি. আরমাউএর হ্যানসেন নামক একজন চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ ও গবেষক। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই গবেষণা থেকে আজ সম্ভব হয়েছে কুষ্ঠরোগীর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রণালী। আরও প্রমাণিত হয়েছে এই রোগ সবক্ষেত্রে সংক্রামকও নয়। হ্যানসেনের আবিষ্কারের পর কুষ্ঠকে "হ্যানসেনস্ ডিজিজ" বা "হ্যানসেনের রোগ"। বংশানুক্রমিক রোগ হিসাবে যাঁরা কুষ্ঠকে নির্দেশ করতেন, তাঁরাও হ্যানসেনের গবেষণা থেকে বুঝতে পারলেন এই রোগটি বংশানুক্রমিক নয়। এক কথায় কুষ্ঠ রোগের ভীতিকে দূর করেছেন হ্যানসেন। তাই পৃথিবীর মানবহিতৈষীদের মধ্যে তিনিও অন্যতম।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ধরাধামে আবির্ভূত হন হ্যানসেন। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসাবে। চিকিৎসক হিসাবে সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু কুষ্ঠরোগীদের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে তিনি বিচলিত হন এবং চিকিৎসা বৃত্তি একরকম পরিত্যাগ করে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কঠোর সাধনা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। বহুদিন গবেষণার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন "মাইকোবাকৃতেরিয়ম লেপরী" নামে এক ধরনের জীবাণুই কুষ্ঠ রোগের মূল কারণ। তিনি আরও প্রমাণ করেন কুষ্ঠের জীবাণুর সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং এই রোগ বংশানুক্রমিক নয়।

হ্যানসেন দীর্ঘকাল ঐ রোগ ও রোগজীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করে যে সব তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন সব বিজ্ঞানী। তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক ও অসংক্রামক দু'ধরনের হয়ে থাকে। কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের ক্ষতনিঃসৃত রসে রোগজীবাণু থাকে। ঐ জীবাণু সুস্থ শরীরে প্রবেশ করলে রোগ সংক্রমণ ঘটে।

হ্যানসেন অবশ্য কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেননি। পরের দিকে আরও বহু বিজ্ঞানী অনুসরণ করেন হ্যানসেনের পথ এবং দীর্ঘ গবেষণার পর আবিষ্কৃত হয়েছে "সালফোন" নামক ঔষুধটি। সেই থেকে দূর হয়েছে কুষ্ঠের ভয়াবহতা। তবে মানুষ এখনও ঠিক সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। এখনও মানুষ ঘৃণা করে কুষ্ঠ রোগীকে। কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি সমাজের অকারণ ঘৃণা এবং অবহেলা আমরা যদি দূর করতে পারি তাহলে আমরা হ্যানসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবো।

হ্যানসেন আর ইহজগতে নেই। বহু বছর আগে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেছেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি ব্যয় করেছেন কুষ্ঠ রোগের পশ্চাতে। শেষ বয়সে অন্য কতকগুলি বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন তিনি। বিশেষতঃ "ইভলিউশন" এবং "ডারউইনের মতবাদের" উপর হ্যানসেনের গবেষণা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবে হ্যানসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আবিষ্কার। গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে এর প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা পৃথিবীর মোট কুষ্ঠরোগীর এক পঞ্চমাংশ। পশ্চিমবঙ্গেও এদের সংখ্যা কিছু কম নয়। আমরা যদি সচেতন হই এবং অযথা ভীতি ও অবহেলা না করে উপযুক্ত চিকিৎসার শরণাপন্ন হই তাহলে এই রোগকে দূর করতে পারবো। আজকাল

খুব ভাল ভাল ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে বহু কুষ্ঠাশ্রম। তাছাড়া প্রাথমিক স্তরে এই রোগ ধরা পড়লে ভয়ের কোন কারণ নেই।

হ্যানসেন তাই অমর বিজ্ঞানী।

লর্ড র‍্যালে

[জন্ম —১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

আকাশের নীল রঙ সম্বন্ধে প্রথমে যিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করেছিলেন তিনি অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে। তাঁরই গবেষণা থেকে জানা যায়, পৃথিবীর ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও বিরল গ্যাসকণিকা ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীল আলোকে প্রতিফলিত করে। তাই আকাশকে আমরা নীল দেখি।

বিজ্ঞানে র‍্যালের আছে বহু অবদান। তিনি একাধারে ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী এবং রসায়ন বিজ্ঞানী। দুটি শাখাই পুষ্ট হয়েছে তাঁর অবদানের দ্বারা। তবে পদার্থবিজ্ঞানই উপকৃত হয়েছে বেশি। তাই পদার্থবিদ্যায় অবদানের জন্য তাকে সম্মানিত করা হয়েছে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর র‍্যালে ইংলণ্ডের এসেক্সে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠ শেষ করার পর তিনি ভর্তি হন কেম্ব্রিজের ট্রিনটি কলেজে। পরে এই কলেজ থেকে তিনি "সিনিয়র র‍্যাংলার" হয়েছিলেন।

র‍্যালের প্রাথমিক গবেষণা আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত। এই পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। প্রমাণ করেন বেগুনী ও নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম

এবং লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা শব্দবিজ্ঞান সংক্রান্ত। এই পর্যায়ে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল শব্দের বৈশিষ্ট্য এবং অনুনাদ। শব্দতরঙ্গ সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তিনি রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। উক্ত পর্যায়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন বাতাসের "আর্গন" নামক দুষ্প্রাপ্য গ্যাসটি। র‍্যালে অবশ্য একা এই গ্যাসটির আবিষ্কর্তা নন। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্যার উইলিয়ম র‍্যামজের নাম।

লর্ড র‍্যালে ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী এবং রসায়ন বিজ্ঞানী। জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছিলেন তিনি। "নাইট" উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সভাপতি মনোনীত করেছিলেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পদার্থ বিজ্ঞান কোনদিনই ভুলতে পারবে না তাঁকে।

রবার্ট কোখ্

[জন্ম—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ।]

পৃথিবীর দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে নির্মূল করতে যে কয়েকজন মানবহিতৈষী বিজ্ঞানী আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন তাঁদের মধ্যে রবার্ট কোখ্ নিঃসন্দেহে একজন। প্রসিদ্ধ জীবাণু-

তত্ত্ববিদ হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে তাঁর নাম। যতদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা থাকবে ততদিন মানুষ ভুলবে না রবার্ট কোখ্‌কে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জার্মানের হানোফার-এর অন্তর্গত ক্লাউসটাল নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন কোখ্‌। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় মানুষের কতকগুলি দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষে তিনি রোগজীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন।

প্রথমে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল অ্যানথ্রাক্স নামক রোগটি। এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং গবাদি পশুদেরই সাধারণত অ্যানথ্রাক্স হয়ে থাকে। বেশ কিছুকাল গবেষণার পর একদিন উক্ত রোগে আক্রান্ত একটি পশুর দেহে কোখ্‌ আবিষ্কার করেন অ্যানথ্রাক্স রোগজীবাণু। অবশেষে অ্যানথ্রাক্স রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন প্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ত্ববিদ হিসাবে। সেই সঙ্গে নামও ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। ইংরাজী ১৮৮০ সাল। বয়স তাঁর তখন ছত্রিশ। জার্মানীর "স্কুল অফ মেডিসিন" তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য। কোখ্‌ও গ্রহণ করেন সে প্রস্তাব। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হল রোগজীবাণু সম্বন্ধে গবেষণার কাজ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন যক্ষ্মা রোগের জীবাণু। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এবার সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধা নিবেদন করলো তাঁকে।

রবার্ট কোখের সবচেয়ে বড় অবদান মনে হয় কলেরা রোগ-জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা। সে সময় কলেরা নামক সংক্রামক ব্যাধিটি ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং আফ্রিকার কোন কোন স্থানে মাঝে মাঝে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগটি এমন প্রবল আকার ধারণ করতো যে দু-দশখানা গাঁয়ের মানুষ

একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত। যখন কলেরা আরম্ভ হতো তখন দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাত। তাতেও রক্ষা পেত না তারা। কলেরা রাক্ষসী ধাওয়া করতো তাদের পিছু পিছু। ফলে গ্রামে গ্রামে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তো এই রোগ।

কলেরার ভয়াবহতা ভাবিয়ে তুলেছিল বহু বিজ্ঞানীকে। মহান বিজ্ঞানী কোখ্ উক্ত রোগ সম্বন্ধে গবেষণার চিন্তা করেন। শীঘ্র একটা সুযোগও এসে গেল। কলেরার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হল মিশরে। কোখ্ আনন্দের সঙ্গে পাড়ি দিলেন বিদেশে। কিছুকাল মিশরে গবেষণা করার পর এলেন ভারতবর্ষে। কলেরার ভয়াবহতা জেনেও কোখ্ পশ্চাৎপদ হলেন না। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কলেরা রোগীকে নিয়ে আরম্ভ করলেন গবেষণা। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে বহুবার কলিকাতার বাহিরেও যেতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষে কিছুকাল গবেষণার পর তিনি পুনর্বার গমন করেন মিশরে। সেইখানেই আবিষ্কার করেন কলেরার জীবাণু। পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা করেন। পরে প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণার ফলাফল। তখনই মানুষ বুঝতে পারল, দূষিত জল এবং দূষিত খাদ্য থেকে কলেরা মানবদেহে সংক্রমিত হয়। কলেরার জীবাণু সম্বন্ধেও প্রথম পাওয়া গেল সঠিক তথ্য।

রবার্ট কোখ্ কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কার না করলেও কলেরার জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণ এক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। অনেক বিজ্ঞানী তখন আত্মনিয়োগ করলেন রোগটির প্রতিষেধক আবিষ্কার করার জন্য। তারই প্রত্যক্ষ ফল কলেরা রোগের টিকা আবিষ্কার। টিকা আবিষ্কারের পর থেকেই দূরীভূত হয়েছে কলেরার ভয়াবহতা। প্রকৃতপক্ষে কলেরা উচ্ছেদের মূলে আছে রবার্ট কোখের অবদান।

কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের পরেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন কোখ্। পৃথিবীর বহু দেশ তখন তাঁকে জানিয়েছিল শ্রদ্ধা ও সম্মান। বেলিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্ষান্ত হল না, নিয়োগ করলো তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে। অপরদিকে নবগঠিত "ইনস্টিটিউট অফ হেলথ" তাঁকে বরণ করলো অধিকর্তা পদে।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও গবেষণাকে পরিত্যাগ করলেন না কোখ্। অধিক উৎসাহে অন্যান্য রোগজীবাণু সম্বন্ধেও আরম্ভ করলেন গবেষণা। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘকাল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গমন করেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে গবাদি পশুকে "রিণ্ডারপেস্ট" নামে একটি রোগ আক্রমণ করতো। ফলে বহু পশুকে প্রাণ হারাতে হতো উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে। কোখ্ দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুকাল অবস্থান করে ঐ রোগের প্রকৃতি এবং প্রতিষেধক দুইই আবিষ্কার করেন।

কোখকে ভারতবর্ষে আসতে হয়েছিল পুনর্বার। সে বছর বোম্বাই শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ আকারে। কোখ্ বোম্বাইতে অবস্থান করে প্লেগ রোগটি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন।

কোখের আরও অবদান আছে। পূর্ব আফ্রিকায় "স্লিপিং সিকনেস" বা নিদ্রারোগ নামে একপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে বহু লোককে অকালে প্রাণ হারাতে হতো। কোখ্ সেখানে গিয়েও ঐ রোগটি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং কারণও নির্ণয় করেছিলেন উক্ত রোগের।

রোগজীবাণু সম্বন্ধে এত বেশি গবেষণা মনে হয় লুই পাস্তুর ছাড়া আর কোন বিজ্ঞানী করেননি। একমাত্র কোখের গবেষণাকে ভিত্তি করে মানুষ বিতাড়িত করেছে বহু দুরারোগ্য ব্যাধিকে। তাছাড়া তাঁর আরও একটি বড় অবদান আছে। তিনিই প্রথম জীবাণুবিদ্যা গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোন জীবাণু

রোগবাহী কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি কতকগুলি শর্ত আরোপ করেছিলেন! সে শর্তগুলি আজও জীবাণুবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে এবং কোন বিজ্ঞানী জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা করতে গেলেই কোখের পথকেই অনুসরণ করেন।

রবার্ট কোখের অবদানের সত্যই কোন তুলনা হয় না। আজ আমরা বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে কল্পনাও করতে পারবো না সেদিনের কলেরা এবং যক্ষ্মার ভয়াবহতা। এই দুই রোগেরই উচ্ছেদের সূচনা হয়েছে কোখের হাতে। একদিন যে সব রোগের নাম শুনলে মানুষের হৃৎকম্প উপস্থিত হতো আজ মানুষ তাদের অপর দশটা সাধারণ রোগের দৃষ্টিতেই দেখছে। এদের মূলে আছে জেনার কোখ্, পাস্তুর, রস, ফ্লেমিং প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান। পৃথিবীকে কেউ যদি সুন্দর করে থাকেন তাহলে এঁরাই করেছেন। তাই এঁরা সব দেশের মানুষের একান্ত আপনার জন। সবাই আমরা ঋণী এঁদের কাছে। এঁদের জন্মদান করে পৃথিবীই হয়েছে পবিত্র।

রবার্ট কোখের মহামুল্য অবদানের জন্য সেদিনও পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জানিয়েছিল শ্রদ্ধা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে বাডেন বাডেন নামক একটি স্থানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করেছেন এই মহান বিজ্ঞানী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতষট্টি বছর। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র মানবজাতির হয়েছে অপূরণীয় ক্ষতি। সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষের কাছে তিনি আপন হয়েই থাকবেন।

উইলহেল্‌ম কনরাড রণ্টগেন

[জন্ম—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।]

জন্মমাত্র যে আবিষ্কারটিকে সারা পৃথিবীর মানুষ স্বাগত জানিয়েছিল সেই আবিষ্কারটির নাম এক্সরে বা অচিন রশ্মি। আবিষ্কারক সেদিন উক্ত রশ্মিটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি। তাই অজানা অচেনা এই রশ্মিটির নাম ইংরাজী "এক্স" অক্ষর দিয়ে সূচিত করেছিলেন। মানুষ শুধু এইটুকুই ধরতে পেরেছিল, সাধারণ আলোকরশ্মি থেকে এই রশ্মির প্রকৃতি আলাদা। মানুষের চামড়ার ভেতর দিয়ে সাধারণ আলোক যেতে পারে না অথচ এই রশ্মি অক্লেশে গমন করতে পারে। অথচ হাড়ের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না। তাইতো মানুষ বুঝতে পেরেছিল, এই রশ্মি প্রয়োগে মনুষ্যদেহের আভ্যন্তরীণ হাড, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ফটো গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে আনবে নব যুগ। তাই প্রথম থেকেই এক্সরের এত কৌলিন্য। সেইদিনই আবিষ্কারকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রশ্মিটির নামকরণ করা হয়েছিল রঞ্জন রশ্মি। আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী স্যার উইলহেল্‌ম কনরাড রন্টগেন বা রনজেন।

এক্স রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে আকস্মিকভাবে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগের কথা। তখন যুরৎসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক রন্টগেন। অপরাপর বিজ্ঞানীর মত তিনিও ক্যাথোড রশ্মিকে নিয়ে গবেষণা করেন। একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে অল্প দূরে রেখেছিলেন বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখানো একটি পর্দা। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! সেদিন ক্যাথোড টিউবকে চালু করতেই দেখলেন, প্লেটের উপর ফুটে উঠল উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা।

ব্যাপারটা একদিন স্যার জে. জে. টমসনও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনোযোগ এদিকে বড় একটা আকর্ষণ করেনি।

রন্টগেনের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন গবেষণা করতে।

প্রায় দুমাস ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর রন্টগেন বুঝতে পারলেন রশ্মিটির প্রকৃতি। বুঝতে পারলেন, সাধারণ আলোর মত এই রশ্মি সরলরেখায় অগ্রসর হয়। সাধারণ আলোক রশ্মি যে সব বাধা অতিক্রম করতে পারে না তাদের অনেককে এই রশ্মি অতিক্রম করতে পারে। তাছাড়া ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবিও তুলতে পারে। এক রকম নিশ্চিত হয়েই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শুভ নববর্ষে রন্টগেন একটি দশ পাতার পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রচার করলেন তাঁর আবিষ্কার। সঙ্গে প্রকাশ করলেন 'এক্সরে'র সাহায্যে তোলা কিছু ফটো।

পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক মহলে উঠল দারুণ কোলাহল। চিকিৎসকদের প্রথমেই মনে হল, মানুষের শরীরের ভেতর অংশের ফটো গ্রহণ করতে আর কোন অসুবিধা হবে না। তখনই চিকিৎসকরা বসে গেলেন পরীক্ষা করতে।

এক্সরের প্রথম প্রয়োগ হয় রন্টগেনের পুস্তিকা প্রকাশের মাত্র কুড়িদিন পরে ডাটমাউথের 'এডি ম্যাকাথির' উপর। ভদ্রলোকের হাতের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছিল। চিকিৎসকরা এক্সরের দ্বারা ফটো গ্রহণ করে তার ভাঙ্গা হাড় ঠিক করে দিলেন। কোন আবিষ্কার না করেই "এডি" বিজ্ঞান ও চিকিৎসাজগতে অমর হয়ে গেলেন ভাঙ্গা হাতের জন্য।

এক্সরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ যে না উঠেছে এমন নয়। একটি নামকরা পত্রিকা সেদিন সমালোচনায় বলেছিল, "রন্টগেনের আবিষ্কারের ফলে মানুষকে তার নিজের কঙ্কাল দেখতে হলো। এতে মানুষের মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে এবং ফল আদৌ ভাল হবে না।" এই পত্রিকার মতই সেদিন মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি এক্সরের সাহায্যে ফটো তুলতে। কিন্তু

বেশিদিন লাগল না। অল্পকাল পরেই এক্সরে আপন বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর সমস্ত মানবমনকে হরণ করে নিল। রণ্টগেনও লাভ করলেন বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর সম্মান।

রণ্টগেনের জন্মস্থান প্রাশিয়া। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শিক্ষালাভ করেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর গবেষণার জন্য গমন করেন উরস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেশ কিছুকাল গবেষণার পর তিনি খ্যাতিলাভ করেন গবেষক হিসাবে এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই নিযুক্ত হন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে।

সেই সময় হার্ৎস, টমসন, লেনার্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নিম্নচাপে বায়ুর মধ্যে তড়িৎমোক্ষণের নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। কাচনল তৈরি করা এবং ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে রণ্টগেনের প্রথম থেকেই ছিল বড় রকমের কৌতূহল। অতি অল্পবয়সেই তিনি এই দুই বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। টমসন, হার্ৎস, লেনার্ড প্রভৃতির দেখাদেখি তিনিও ঐ একই পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। সেই সময় আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন এক্সরে। কেউ কেউ মনে করেন, ফটোগ্রাফিক প্লেটে একটা চাবির ছবি দেখে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েই তিনি আবিষ্কার করেছেন এক্সরে।

এই মহান আবিষ্কারের জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রণ্টগেন লাভ করেন "রামফোর্ড পদক"। পরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সম্মানিত করা হয় "নোবেল পুরস্কার" প্রদান করে। রণ্টগেনই পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপক।

এক্সরে আবিষ্কার ব্যতীত রণ্টগেনের তড়িৎবিজ্ঞানের উপর আছে মূল্যবান গবেষণা। তিনি কিছুকাল তাপবিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা করেছিলেন এবং গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান।

শেষ বয়সে রণ্টগেন উরসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে

যোগদান করেছিলেন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

টমাস আলভা এডিসন

[জন্ম—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।]

টমাস আলভা এডিসনকে বলা হয় বিজ্ঞানের যাদুকর। তাঁর মত এত বেশি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর কোন বিজ্ঞানীর দ্বারা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এডিসনের মত দ্বিতীয় কোন বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ তিনি কোন স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন করেননি। কোন গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়নি তাঁর জন্য। যতটুকু শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে কেবল নিজেরই প্রচেষ্টায়। এমন প্রবল তাঁর অনুসন্ধিৎসা, এমন অসাধারণ তাঁর প্রতিভা এবং এমন একলব্যের সাধনা ছিল বলেই হয়ত বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসন লাভ করেছেন তিনি।

আর আশ্চর্য তাঁর জীবন! এক ফেরিওয়ালারূপে জীবন আরম্ভ করেছিলেন তিনি। তারপর নিজ কর্মকুশলতায় এবং প্রতিভায় লাভ করেছিলেন প্রচুর অর্থ ও সম্মান। প্রতিভা এমনই জিনিস!

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ওহিও প্রদেশের মেনলো নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন টমাস আলভা এডিসন। তিনি ছিলেন পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। মা ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষিকা। পিতার আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি ভালই ছিল। তথাপি বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। শোনা যায়, মাত্র কয়েক মাস তিনি বিদ্যালয়ে পড়তে গেছিলেন। পাঠকালে

শিক্ষকদের এত বেশি জিজ্ঞাসা করতেন যে শিক্ষকরা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছিলেন এবং বালক এডিসনকে নানা বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে পড়া বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু পিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন বালকের প্রবল অনুসন্ধিৎসা দেখে। তিনিই সাধ্যমত শিক্ষাদান করেছিলেন পুত্রকে এবং নিবৃত্তও করেছিলেন কিছু কিছু অনুসন্ধিৎসা।

এডিসনের বয়স যখন মাত্র বার বছর, সেই সময় তাঁকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা তার কারণ ছিল না। সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী স্বনির্ভরতা অর্জন করার প্রয়াস মাত্র। কথিত আছে, সেই বার বছর বযসের বালক এডিসন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং খবরের কাগজ ফেরি করতেন।

যখন এডিসনের বয়স পনের, সেই সময় একটি রেলগাড়ির কামরায় প্রেস স্থাপন করে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংবাদ-পত্রটি যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে যা উপার্জন করতেন তাতেই কোনরকমে নিজের খরচ চলত।

সে সময় একটি ঘটনা ঘটে। একদিন ষ্টেশনে খবরের কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, সেখানকার ষ্টেশন মাস্টারের ছোট্ট ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে রেললাইনের উপর। আর সাক্ষাৎ যমদূতের মত ছুটে আসছে একটি রেলগাড়ী। এডিসন মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে ধরে আনেন ছেলেটিকে। রক্ষা পেল ছেলেটি। কৃতজ্ঞ ষ্টেশন মাষ্টার এডিসনকে কাছে রেখে টেলিগ্রাফের কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে ঢুকিয়ে দিলেন একটা চাকরিতে।

চাকরিটা ছিল টেলিগ্রাম অপারেটারের কাজ। দিনের বেলায় টেলিগ্রাম অফিসে যে সব টেলিগ্রাম আসতো সেগুলিকে ধরতে হতো এডিসনকে। কখনও বা বাহিরে যেতে হতো।

কাজ পেয়ে খুবই খুশি হলেন এডিসন। একদিকে কাজ করেন আর অপর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন যন্ত্রপাতিগুলিকে। ফলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করলেন ভালভাবে। তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল উদ্ভাবনী শক্তি। এবার সে শক্তি প্রয়োগ করলেন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণে। এমনকি যন্ত্রের মাধ্যমে টেলিগ্রামের সঙ্কেত ধরতেও সচেষ্ট হলেন। সফলও হয়েছিলেন তিনি। অনেক সময় নিজে কাছে না থাকলেও আপনা হতেই টেলিগ্রাম রেকর্ড হয়ে যেত কাগজে। একবার তাঁর সে যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। এডিসন তখন পড়লেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষনজরে। ফলে চাকরিটি হারাতে হল তাঁকে।

এডিসন তখন কপর্দকশূন্য। চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে পড়লেন নিউইয়র্ক শহরে। বেশ কয়েকদিন এখানে ওখানে চাকরির বৃথা চেষ্টা করার পর এক অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল তার জীবনে।

এডিসন এক বন্ধুর কাছে নিউইয়র্কে রাত্রি যাপন করতেন আর দিনের বেলায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন চাকরির জন্য। একদিন বন্ধুটি যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো সেখানকার মূল যন্ত্রটি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। অফিসের ম্যানেজার একে একে ডেকে আনলেন শহরের নামকরা সব বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু কেউ সারাতে পারল না যন্ত্রটিকে। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

এডিসন বন্ধুর কাছ থেকে সংবাদটা পেয়ে কৌতূহলী মন নিয়ে গোড়া থেকে দেখেছিলেন সব ব্যাপার। বিশেষজ্ঞরা যখন হার মানলেন, তখন এডিসনই এগিয়ে এলেন ম্যানেজারের সম্মুখে। বললেন, "যদি অনুমতি দান করেন, তাহলে আমি একবার যন্ত্রটাকে দেখবো"।

ষোল বছর বয়সের এক কিশোরের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলেন

ম্যানেজার। বুঝিবা মনে মনে হেসেছিলেন তিনি। তবুও "না" বলতে পারলেন না। নিজেই এডিসনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন যন্ত্রের কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! একটু খুটখাট করতেই যন্ত্রটা চালু হয়ে গেল। আনন্দে এডিসনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ম্যানেজার। তারপর মাসে তিনশ ডলার মাইনেতে বহাল করলেন চাকরিতে।

আপাততঃ অর্থের ভাবনা দূরীভূত হল এডিসনের। খরচ বাদে যেটুকু উদ্বৃত্ত হতো তাতে কিনতে লাগলেন বিজ্ঞান গবেষণার নানা সরঞ্জাম। অরাম্ভ হল বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্মাণ। যে প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি কাজ করতেন সেই অফিসেরই সুবিধার জন্য তিনি তৈরি করে দিলেন বিশেষ এক ধরনের মেসিন। মেসিনটি এমন কার্যকরী হয়েছিল যে উক্ত প্রতিষ্ঠান নগদ চল্লিশ হাজার ডলার দাম দিয়ে কিনে নিলেন।

এডিসন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ করে স্থাপন করলেন একটি গবেষণাগার। যন্ত্র নির্মাতা হিসাবে নামও ছড়িয়ে পড়ল এডিসনের। বহু জায়গা থেকে এবার আসতে লাগল যন্ত্র নির্মাণের অর্ডার। এডিসনের আর্থিক অবস্থার আরও হল উন্নতি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জার্সির অন্তর্গত মেনলো পার্কে স্থাপন করলেন একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ বিরাট গবেষণাগার। এর পরে এডিসন যা কিছু আবিষ্কার করেছেন সবই প্রকাশিত হয়েছে উক্ত গবেষণাগার থেকে।

এডিসনের প্রথম গবেষণা ছিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংক্রান্ত। এই দুটি যন্ত্রের অভাবনীয়ভাবে উন্নতি সাধন করেছেন তিনি। তারপর এডিসন চিন্তা করেন মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখার জন্য। তাঁর ঐ চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই। মোম মাখান কাগজে নিজের কণ্ঠস্বরকে রেকর্ড করে পুনরায় যন্ত্রের দ্বারা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন। প্রথম অবশ্য এই কণ্ঠস্বর শোনা গেছিল অত্যন্ত ক্ষীণভাবে। পরে যন্ত্রটির

উন্নতি সাধন করে এডিসন আবিষ্কার করেন সে যুগের একটি চমকপ্রদ যন্ত্র ফোনোগ্রাফ।

এডিসনের পরবর্তী আবিষ্কার বৈদ্যুতিক বাতি। ডায়নামো আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎ তখন হয়েছে সহজলভ্য। এডিসন চিন্তা করলেন, এই বিদ্যুতের দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে ঘরকে আলোকিত করা যেতে পারে। আরম্ভ হল গবেষণা। শেষে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বায়ুশূন্য কাচের বাল্বের মধ্যে কার্বন ফিলামেণ্ট রেখে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালেন। বাতি জ্বলতে লাগল। বেশ কয়েক দিন ধরে বাতিকে জ্বালিয়ে রাখতেও ফিলামেণ্ট পুড়ে গেল না। বিদ্যুৎ এতদিনে মানুষের বাহন হলো। এডিসনের নামও ছড়িয়ে পড়ল। পরিচিত হলেন "মেনলো পার্কের যাদুকর" নামে।

ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ বিজ্ঞানী "যোসেফ উইলসন স্বোয়ান"ও ঐ একই পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেছিলেন বৈদ্যুতিক বাতি। সেটি প্রমাণিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে। আরম্ভ হল বাদপ্রতিবাদ। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড দু'দেশই দাবী জানাল বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কর্তা তাদের দেশের লোক। এই নিয়ে মামলাও চললো। শেষে এডিসনই মীমাংসা করে দিলেন। তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী বাতিটির নামকরণ করা হল "এডিস্বোয়ান ল্যাম্প"। বলা বাহুল্য, উভয় আবিষ্কর্তার নামের অংশবিশেষ গ্রহণ করে এইভাবে নামকরণ করা হয়েছিল।

এডিসনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চলচ্চিত্র। ফোনোগ্রাফ সম্বন্ধে গবেষণা করা কালেই চলচ্চিত্রের চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল, ফোনোগ্রাফের সিলিণ্ডারের গায়ে পরপর কতকগুলি ছবি বসিয়ে হাত ঘুরিয়ে দ্রুত ছবিগুলিকে বার করলে হয়ত সচল ছবি পাওয়া যাবে। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে পরবর্তী-কালে তিনি অনেকগুলি ফটো তুলে এঁটে বসিয়ে দিয়েছিলেন সিলিণ্ডারের গায়ে। ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন একটি

শক্তিশালী লেন্সের ভেতর দিয়ে। হাতল ঘুরিয়ে যখন ছবিগুলোকে পর পর বার করলেন তখন তাঁর মনে হল ছবি যেন সচল হয়ে উঠেছে।

এ সম্বন্ধে ভালভাবে আরম্ভ হল গবেষণা। অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে আনিলেন পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ এবং অল্প চওড়া সেলুলয়েডের ফিল্ম। তারপর নিজের তৈরি মুভি ক্যামেরার সাহায্যে ফিল্মে তুললেন ফটো। অবশেষে ঐ ছবি দেখানর জন্য নির্মাণ করলেন একটি যন্ত্র। এবার লেন্সের দ্বারা ছবিকে পর্দায় প্রোজেক্ট করার ব্যবস্থা হল। চমৎকার হল ছবি। এডিসন নিজেই বিস্মিত হলেন ছবি দেখে। যন্ত্রটির নামকরণ করলেন "কিনেটোস্কোপ"।

বিজয়ী এডিসন যন্ত্রটির উন্নত রূপ প্রদান করতে আরও করলেন গবেষণা। পরিশেষে তাঁর এই আবিষ্কার থেকে জন্মগ্রহণ করল চলচ্চিত্র। আজ এই ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে এখনও অনুসরণ করা হয়ে থাকে এডিসনের ব্যবস্থাকে।

এডিসনের আছে অন্যান্য বহু অবদান। এমন অসামান্য তার প্রতিভা ছিল যে, যেইখানেই তিনি হস্তক্ষেপ করতেন সেইখানেই লাভ করতেন বিজয়ীর সম্মান। তাঁর আবিষ্কারের পরিমাণ এত বেশি যে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। শোনা যায়, সারাজীবনে এক হাজারেরও বেশি পেটেন্ট তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

কর্মব্যস্ত এই সংসারে মানুষ একঘেয়েমি থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলেই তার মনে আসে টমাস আলভা এডিসনের কথা। গ্রামোফোন রেকর্ডের গান এবং সিনেমা এই দুটিই সাধারণ মানুষের আনন্দোপকরণ। এই দুটি জিনিসই এডিসনের গবেষণার ফল। তাঁর অবদানকে আরও ভালভাবে অনুভব করতে পারা যায় যখন মানুষ লোডশেডিং-এর রাতে সন্তর্পণে ভূতের মত পায়চারি করে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর "ওয়েষ্ট অরেঞ্জে" নিজের

বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই মহান বিজ্ঞানী মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর।

আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল

[জন্ম—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ।]

টেলিফোনের আবিষ্কর্তা হিসাবে আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল বিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তবে তিনি কেবলমাত্র টেলিফোনের আবিষ্কর্তা নন আরও বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ গ্রেহাম বেল এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি শিক্ষালাভ করেন এডিনবরা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর তিনি পিতার সঙ্গে যাত্রা করেন কানাডায়। সেখানে প্রথমে তিনি একটি মূক ও বধিরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পরে লাভ করেছিলেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ।

মূক ও বধিরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণ করেন। যন্ত্রটি আবিষ্কার তাঁর দরদী মনের পরিচায়ক। বধিরদের সম্মুখে একই কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির জন্যই আবিষ্কার করেছিলেন যন্ত্রটি। তিনি বধিরদের শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন। পরিণত বয়সে ফটোফোন, ইনডাকশান ব্যালেন্স প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।

গ্রেহাম বেলের সর্বাধিক খ্যাতি টেলিফোনের আবিষ্কর্তা হিসাবে। উক্ত যন্ত্রটি আবিষ্কারের পেছনে তাঁর আছে দীর্ঘ দিনের

গবেষণা ও কৃচ্ছ্রসাধন। তিনিই প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বরকে দূরে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁর এই আবিষ্কারকে কেউ স্বাগত জানায়নি। বরং সেদিন তাঁকে অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁর যন্ত্রকে "খেলনা" বলে উপহাস করতেও বাদ দেয়নি। পরের দিকেই তাঁর যন্ত্রটির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং একটি বড় আবিষ্কার হিসাবে বিজ্ঞানে স্থান লাভ করেছে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল পরলোক গমন করেন।

জোহান্স গুটেনবার্গ

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে জার্মানীর প্রসিদ্ধ কারিগর গুটেনবার্গ বিজ্ঞানজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বাল্যে লেখাপড়ার তেমন সুযোগ লাভ করতে পারেননি তিনি। পিতার ব্যবসাকে অবলম্বন করে এক মণিকার হিসাবে জীবন শুরু করেন।

গুটেনবার্গ ছিলেন একজন ভাল শিল্পী। ব্যবহারটা ছিল অত্যন্ত ভদ্র। তাছাড়া সৎ ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহরে। তাই দেশের অর্থশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই তাঁর দোকানে এসে ভিড় করতেন।

গুটেনবার্গের তাস খেলার নেশা ছিল প্রবল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রী এনার সঙ্গে বসে যেতেন তাস খেলতে। কিন্তু বর্তমানের মত সেকালে বাজারে ভাল তাস পাওয়া যেত না। শিল্পীরা নিজ হাতে মোটা কাগজ কেটে তার উপর তাসের ছবি আঁকতেন। গুটেনবার্গের খেলতে খেলতে একদিন খেয়াল চাপল মাথায়, তিনি খুব সুন্দর করে এক বাণ্ডিল তাস আঁকবেন! তক্ষুণি খেলা বন্ধ করে বসে গেলেন তাস আঁকতে।

দুচারখানা তাস এঁকেও ফেললেন। তারপর মনে এল চিন্তা, এত কষ্ট না করে সহজ উপায়ে তাসের ছবি আঁকা যায় না কি? রং তুলি ফেলে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে গেলেন ভাবতে। শেষে অনেক চিন্তা করে কাঠের ব্লক তৈরি করে, তার উপর কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। সত্যই খুব সুন্দর তাস পাওয়া গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন গুটেনবার্গ। অনেকগুলি কাঠের ব্লক তৈরি করে বাণ্ডিল বাণ্ডিল তাস বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

দিন যায়। শিল্পী গুটেনবার্গের চিন্তাধারা অন্যরূপ গ্রহণ করলো। ভাবলেন একদিন, কাঠের উপর মহাপুরুষের ছবি এঁকে ব্লক করলে কেমন হয়? খেয়ালী শিল্পী তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন কাজে। এবার তিনি আরও একটা কাজ করলেন। ছবির নিচে কাঠকে সূক্ষ্ম এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে অক্ষরের ব্লক করে মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বেশ কয়েকজন মহামনীষীর ছবি এইভাবে তৈরি করে খাটিয়ে রাখলেন দোকানের দেওয়ালে।

গুটেনবার্গের দোকানে ভাল ভাল লোকের যাতায়াত ছিল। তাঁরা সবাই গুটেনবার্গের কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ভাল দাম দিয়ে বহু লোক ছবি কিনতে লাগল। ব্লক তৈরি থাকার জন্য তিনি অক্লেশে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সাদা কাগজে ছাপ দিয়ে প্রয়োজনীয় ছবি সরবরাহ করতেন। (শোনা যায়, তিনি প্রথমে একটি কাঠের ফলকে ছবি এবং লেখা এঁকে ফেলতেন। তারপর প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি কাঠকে কেটে উড়িয়ে দিতেন। পরিশেষে এই সোজা ব্লকটা আর একটি কাঠের ফলকে ছাপ দিয়ে উল্টো ব্লক তৈরি করে নিতেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তী ব্লকটাই হতো আসল ব্লক।)

একদিন গুটেনবার্গের দোকানে এলেন এক পাদরী সাহেব।

গুটেনবার্গের কীর্তি দেখে তিনিও অবাক হয়ে গেলেন, এবং কয়েকখানা ছবি কিনে বাসায় ফিরে এলেন। পাদরী সাহেবের হঠাৎ মনে হল, মহাপুরুষদের জীবনী একটু বিস্তৃতভাবে লিখে এইভাবে ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে পারলে দেশের লোক খুবই উপকৃত হতো !

এবার পাদরী সাহেব করলেন কি? কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনী লিখে পুনবার হাজির হলেন গুটেনবার্গের কাছে। বললেন, যেমন করে হোক এগুলি তাকে ছাপিয়ে দিতে হবে। যা খরচ লাগে সবই তিনি বহন করবেন।

গুটেনবার্গ মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কিন্তু হার মানলেন না। কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাঠের ফলকের উপর একটির পর একটি করে খোদাই করলেন অক্ষরের উল্টো প্রতিলিপি। এইভাবে চৌষট্টিখানা ফলক তৈরি করে একদিন প্রকাশ করলেন চৌষট্টি পৃষ্ঠার মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ। পৃথিবীর এইটিই প্রথম ছাপার গ্রন্থ। যদিও অনেকে মনে করেন, গুটেনবার্গের বহুপূর্বে চীনদেশ ও জাপানে কাঠের ব্লক তৈরি করে অক্ষর ছাপানোর রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। তবুও গুটেনবার্গের আবিষ্কারের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না। তাদের পদ্ধতি অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

একটি পুস্তক প্রকাশ করার পর গুটেনবার্গের উৎসাহ বেড়ে গেল। এবার তিনি বাইবেল ছাপতে মনস্থ করলেন। স্ত্রী এনা এবং আরও কয়েকজন সহযোগী নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন কাজ। কিন্তু আরম্ভের মুখেই ঘটল এক অঘটন।

তখন সবেমাত্র গোটাকয়েক পৃষ্ঠার ব্লক তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা করতে গিয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেল ব্লকগুলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই পাতলা কাঠগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। শুভকাজে এই ধরণের বিঘ্ন ঘটায় হতাশ হলেন গুটেনবার্গ। প্রথমটায় দুঃখে

ভেঙ্গে পড়লেও ধৈর্য হারালেন না। চিন্তা করলেন, এমন কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?

ভাবতে ভাবতে এক নতুন চিন্তা এল মাথায়। এবার তিনি কাঠের উপর অক্ষর খোদাই না করে কেবল কাঠের অক্ষরই তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। পর্যাপ্ত অক্ষর তৈরি হওয়ার পর তিনি কাঠের ফলকে লেখার অনুরূপ সজ্জিত করলেন। তারপর সেটির উপর কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। দেখলেন, ছাপার কাজে এই পদ্ধতিই সুবিধাজনক। কাঠের অক্ষরগুলির নামকরণ করলেন টাইপ। কাঠের টাইপ কয়েকবার ছাপ দেওয়ার পর ভোঁতা হয়ে যায় বলে পরের দিকে তিনি ধাতুনির্মিত টাইপ ব্যবহার করেন। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দেই গুটেনবার্গ টাইপ আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই বছরই বাইবেল ছেপে প্রকাশ করেছিলেন।

গুটেনবার্গ যতদিন থেকে মুদ্রণশিল্পের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ততদিন থেকেই স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী কারও ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল না। তা না হলে বাইবেল বা অন্যান্য পুস্তক ছেপে প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আদৌ ছিল না। কেবল সারাজীবন ধরে উক্ত শিল্পের উন্নতির জন্য রাতদিন পরিশ্রমই করে গেছেন। নিজের যা কিছু সম্বল ছিল তাও বিলিয়ে দিয়েছিলেন ছাপাখানার পেছনে।

শেষ বয়সে তাঁকে চরম দারিদ্র্যকে বরণ করতে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর একমাত্র উৎসাহদাত্রী স্ত্রী এনা মারা যাওয়ার পর তিনি যেন সমূহ কর্মক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন নিতান্ত অনাহারে কাল কাটাতে হল তখন মেঞ্জের পাদরীসাহেব দয়াপরবশ হয়ে একটা ছোট্ট পেনসনের ব্যবস্থা করেন। সেই পেনসনের উপর নির্ভর করেই গুটেনবার্গকে কাটাতে হয়েছে অবশিষ্ট জীবনটা।

আজ ছাপাখানার অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ওটসার মারগেন থ্যালার নামক এক আমেরিকান যন্ত্রবিদ লাইনো টাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করে মুদ্রণ শিল্পকে চরম উৎকর্ষ দান করে গেছেন। পরের দিকে মনোটাইপ, অফসেট প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ছাপার কাজ অনেক সহজও হয়েছে। কিন্তু গুটেনবার্গের সেই কঠের টাইপ বিজ্ঞান কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এমন কি তাঁর দ্বারা ছাপা সেই চৌষট্টি পৃষ্ঠার জীবনীগ্রন্থ এবং বাইবেলকেও না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকদের মধ্যে গুটেনবার্গও একজন।

ফ্রান্সিস বেকন্

[জন্ম—১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ।]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একরকম দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অথচ তারই পাশাপাশি চলছিল কারিগরদের দ্বারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন। কারিগররা অবশ্য বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারে পাশে যেতেন না। কেবল প্রয়োজনই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করাতো নব নব আবিষ্কারে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মধ্যে দূরত্বও ছিল অনেকখানি। পণ্ডিতেরা চিন্তা করে দেখলেন, এই দুটির মধ্যে বিভেদ আদৌ নেই। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। তখন তাঁরা বিজ্ঞান ও কারগরীবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধনে যত্নবান হন। অপরদিকে তাঁদের দেখাদেখি কারিগররাও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। ফলে দার্শনিক তত্ত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে বিজ্ঞান তার আপন পথটি খুঁজে পায়। এক কথায় তখনই

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে একটি বিপ্লব। এই বিপ্লবকে যাঁরা বহন করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস্ বেকন্ নিঃসন্দেহে একজন।

বেকন্ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তিনি অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স-এর বিচার বিভাগে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ আসে। তখন বেকন্ অধ্যাপনা বৃত্তি পরিত্যাগ করে বিচার বিভাগে যোগদান করেন এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে মনোনীত হন।

বেকন্ ছিলেন মূলতঃ দার্শনিক। তবে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক টান। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করতেন। পরে কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রহ করেন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমূহ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী। তার ফলেই বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে উদিত হয়।

বেকন্ অতঃপর কারিগরীবিদ্যা এবং প্রচলিত যন্ত্রপাতির দিকে আকর্ষণ বোধ করেন। কিছুকাল এ বিষয়ে চিন্তা করার পর তাঁর ধারণা জন্মে, ঐ বিজ্ঞান এবং কারিগরীবিদ্যাই মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। উৎসাহিত বেকন্ এবার আরম্ভ করলেন প্রচণ্ড পরিশ্রম। তাঁর চিন্তা ভাবনাগুলি ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন "দি অ্যাডভানস্‌মেণ্ট অফ লার্নিং" নামক একখানি পুস্তকের আকারে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যাকে জনপ্রিয় করার এই তাঁর প্রথম প্রয়াস এবং সত্য কথা বলতে কি, এই ধরণের প্রয়াস তাঁর পূর্বে কেউ করেননি।

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে বেকন্ প্রকাশ করেন "গ্রেট ইনষ্টরেশন অফ

লার্নিং" নামক দ্বিতীয় একখানি মহামূল্য পুস্তক। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই পুস্তকখানির গুরুত্ব অনেকখানি। পুস্তকটির প্রথম খণ্ডে বেকন প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন এবং নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এই খণ্ডে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞানকে অগ্রগতি দান করতে হলে নতুন নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি সংগ্রহ করতে হবে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাতে এই কাজে এগিয়ে আসেন তার জন্যও তিনি অনুরোধ রাখেন।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যন্ত্রবিদ্যার উল্লেখ করেন এবং কোন্ কোন্ যন্ত্রে কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্ত হয়েছে তাও ব্যাখ্যা করেন। তৃতীয় খণ্ডে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। চতুর্থ খণ্ডে কারিগরী জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করেন। পুস্তকখানির আরও কয়েকটি খণ্ড তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সময়াভাবে তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি।

ফ্রান্সিস বেকনের চিন্তাধারা তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে আলোড়নের যথেষ্ট সৃষ্টি করে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানরাজ্যে তিনিই প্রথম বিপ্লবের সূচনা করেন। পরে গ্যালিলিও, দেকার্ত প্রভৃতি মহামনীষীদের আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্নে বিজ্ঞান তার নিজের পথের সন্ধান লাভ করে। তাই ফ্রান্সিস বেকনের নাম বিজ্ঞান চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে।

১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান চিন্তানায়কের দেহান্তর ঘটে।

জোসেফ ব্লাক

[জন্ম—১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।]

জোসেফ ব্লাক ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় ফ্রান্সে। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে স্বদেশে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানকার একটি নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

ব্লাক প্রথমে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন পরে শারীরবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করায় একই সঙ্গে দুটি বিষয়ই অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। তারপর উভয় বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করার পর আরম্ভ করেন গবেষণা। সেই সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল মানবদেহের উপর চুন এবং কস্টিক পটাশের ক্রিয়া। দীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি উক্ত বিষয়ে লাভ করেন ডক্টরেট ডিগ্রি। ব্লাকের গবেষণা এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, যাঁরা তাঁর গবেষণাপত্রগুলি পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, শারীরবিদ্যার ক্ষেত্রে এত উচ্চাঙ্গের গবেষণা পূর্বে আর হয়নি।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফ ব্লাক সেই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়েই শারীরবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অথচ কি খেয়াল হল তাঁর! শারীরবিদ্যা বা রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা না করে আরম্ভ করলেন তাপবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান বরফের লীন তাপ নির্ণয়। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, বরফ গলন শুরু হলে তাপ প্রদান সত্ত্বেও যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না। অর্থাৎ

তাপ প্রদানে বরফের অবস্থান্তর ঘটে কিন্তু থার্মোমিটারের দ্বারা তাপ ধরা যায় না। বরফটা সম্পূর্ণরূপে গলে গিয়ে জল হওয়ার পরই ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। পরীক্ষার দ্বারা ব্লাক আরও প্রমাণ করেন, এক গ্রাম বরফকে গলাতে হলে ৮০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয় অথচ থার্মোমিটারে এই তাপ ধরা পড়ে না। তাই নামকরণ করেন "লীন তাপ" বা গুপ্ত তাপ।

ব্লাকের এই আবিষ্কারের ফলে তাপবিজ্ঞানে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বরফ গলনের এবং বাষ্পীভবনের লীন তাপ নির্ণীত হয় সেই থেকেই। ব্লাকের পরীক্ষাগুলি তাই তাপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য করা হয়।

সারাজীবন ব্লাক অধ্যাপনা এবং গবেষণার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করে গেছেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ব্লাক পরলোক গমন করেন।

জোসেফ ব্লাক ছিলেন আদর্শ অধ্যাপক। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশ বিদেশের বহু ছাত্র তাঁর কাছে অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য আসতেন। ব্লাকও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। ছাত্রদের সব সময় তিনি উৎসাহ দান করতেন, যাতে তাঁরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাই তাঁর বহু ছাত্র উত্তরকালে বিজ্ঞানে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বিজ্ঞানের বহু শাখায় ব্লাকের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শারীরবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার মত রসায়ন শাস্ত্রেও আছে তাঁর বহু অবদান। এ কথা সত্য যে, সে সময় বিজ্ঞান জোসেফ ব্লাকের মত কয়েকজন প্রতিভাবান অধ্যাপককে লাভ করেছিল বলেই এত তাড়াতাড়ি তার শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তার করতে পেরেছিল।